

দেববাণী

স্বামী বিবেকানন্দ



ষষ্ঠ সংস্করণ

সংরক্ষিত

মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক—স্বামী আনন্দবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

COPYRIGHTED BY
*The President, Ramakrishna Math,
Belur Math, Howrah.*

১৩৫৩

প্রিন্টার—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ হাজরা
বোস প্রেস
৩০, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা

নিবেদন

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় ক্রমাগত বক্তৃতার পর বক্তৃতা-দানে ক্লান্ত হইয়া কয়েক সপ্তাহের জন্ত নিউ-ইয়র্ক হইতে কিয়দূরবর্তী সহস্রদ্বীপোত্তান (Thousand Island Park) নামক স্থানে নির্জনবাস করেন। কয়েকজন আমেরিকা-বাসী তাঁহার উপদেশে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ঐ সুযোগে সদাসর্বদা তাঁহার নিকট বাস করিয়া বিশেষভাবে সাধন-ভজন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজি তথায় প্রতিদিন প্রাতে যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার কিছু কিছু তাঁহার জনৈক শিষ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে 'Inspired Talks' নামে প্রকাশিত হয়। বর্তমান পুস্তকখানি উহারই বঙ্গানুবাদ।

ইতি অনুবাদকণ্ঠ



আমেরিকায় স্বামীজি

Coon

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এক তরুণবয়স্ক হিন্দু সন্ন্যাসী ভ্যাঙ্কুভারে পদার্পণ করিলেন। তিনি চিকাগোর ধর্ম-মহাসভার যোগদান করিবার জন্ত যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সর্বজনপরিচিত ধর্মসংঘের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরূপে নহে। কেহ তাঁহাকে চিনিত না, এবং তাঁহার নিজের সাংসারিক জ্ঞানও অল্প ছিল; তথাপি মাদ্রাজের কয়েকজন উৎসাহী যুবক তাঁহাকেই এই মহৎ কার্যের জন্ত মনোনীত করিয়াছিল; কারণ, তাহাদের ক্রম বিশ্বাস ছিল যে, অল্প যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা তিনিই ভারতের প্রাচীন ধর্মের যোগ্যতর প্রতিনিধি হইতে পারিবেন এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিল। এই অর্থ এবং দুই একজন দেশীয় নরপতি যাহা দান করিয়াছিলেন, তাহাই সম্বল করিয়া তরুণ সন্ন্যাসী—তদানীন্তন অপরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ—এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এরূপ একটি মহান উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা করিতে তাঁহাকে বিপুল সাহস অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ভারতের পুণ্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশযাত্রা করা হিন্দুর নিকট কত গুরুতর ব্যাপার তাহা পাশ্চাত্যবাসী আমাদের ধারণাতীত। সন্ন্যাসীদিগের

সম্বন্ধে একথা বিশেষ করিয়া খাটে ; কারণ, জীবনের ব্যবহারিক জড়-প্রধান অংশের সহিত তাঁহাদের সমগ্র শিক্ষাদীক্ষার কোনই সম্পর্ক নাই। টাকা-কড়ি লইয়া নাড়াচাড়া করার, অথবা নিজের পায়ে ভিন্ন অপর কোন উপায়ে ভ্রমণ করার অভ্যাস না থাকায় স্বামীজি এই সুদীর্ঘ পথের প্রত্যেক অংশে প্রতারিত হন এবং লোকে তাঁহার অর্থ অপহরণ করে। অবশেষে যখন তিনি চিকাগো পৌঁছিলেন, তখন প্রায় কপর্দকশূন্য। তিনি সঙ্গে কোন পরিচয়পত্র আনেন নাই, এবং এই বিরাট নগরীতে কাহাকেও চিনিতেন না।* এই-রূপে স্বদেশ হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ ব্যবধানে অপরিচিতগণের মধ্যে একাকী বাস করা একজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিরও হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে; কিন্তু স্বামীজি এ সমস্ত ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে ভগবানের কৃপা তাঁহাকে সতত রক্ষা করিবেই করিবে।

প্রায় এক পক্ষ কাল তিনি তাঁহার হোটেলের কর্তা ও অন্যান্য লোকের অত্যধিক দাবী পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে সামান্য অর্থ ছিল তাহা এখন এত কমিয়া গিয়াছিল যে,

* পরে জনৈক মাদ্রাসী ব্রাহ্মণ চিকাগো-নিবাসী এক শুভ্রলোককে স্বামীজির সম্বন্ধে লিখেন, এবং ইনি এই হিন্দু যুবককে নিজ পরিবারে স্থান দান করেন। এইরূপে যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়, তাহা স্বামীজি ষতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। পরিবারভুক্ত সকলেই স্বামীজিকে অতিশয় ভালমানিতেন, তাঁহার অপূর্ব সদগুণরাজির গুণগ্রাহী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা ও সরলতার সমাদর করিতেন। এই সকল সম্বন্ধে তাঁহার প্রায়ই স্মৃতি ও আগ্রহের সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেন।

তিনি বেশ বুঝিলেন, যদি তিনি রাস্তায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ এমন একটি স্থান খুঁজিয়া লইতে হইবে, যেখানে থাকিবার খরচ অপেক্ষাকৃত কম। যে মহৎ কার্য্যভার তিনি একরূপ সাহসের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইল। মুহূর্ত্তের জ্ঞান নৈরাশ্র ও সন্দেহের একটি ঢেউ তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গেল এবং তিনি এই ভাবিয়া বিশ্বাসস্থিত হইতে লাগিলেন, কেন তিনি নিরোধের মত সেই সকল মাথা-গরম মাদ্রাজী স্কুলের ছোঁড়াদের কথা শুনিয়াছিলেন? তথাপি উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে টাকার জ্ঞান তার করিতে এবং প্রয়োজন হইলে ভারতে ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বোষ্টন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু যাহার উপর তিনি এত দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্তরূপ হইল। রেলগাড়ীতে এক বর্ষীয়সী মহিলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং তিনি তাঁহার আগ্রহ উদ্বোধিত করিতে এতদূর সমর্থ হইলেন যে, সেই মহিলা তাঁহাকে নিজ আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জ্ঞান নিমন্ত্রণ করিলেন। এইখানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। ইনি একদিন স্বামীজির সহিত নির্জনে চারি ঘণ্টা কাল একত্র থাকিবার পর তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কেন চিকাগো ধর্ম্ম-সভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে গমন করিতেছেন না?”

স্বামীজি তাঁহার অসুবিধাগুলি বুঝাইয়া দিলেন; বলিলেন যে,

তাঁহার অর্থও নাই এবং উক্ত মহাসভাসংলিষ্ট কোন ব্যক্তির নামে পরিচয়পত্রও নাই। অধ্যাপক অমনি উত্তর দিলেন, “শ্রীশুক্ত বনি আমার বন্ধু, আমি আপনাকে তাঁহার নামে এক পত্র দিব।” এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উহা লিখিয়া ফেলিলেন এবং তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথাও লিখিয়া দিলেন, “দেখিলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন্দু আমাদের সকল পণ্ডিতগণকে একত্র করিলে যাহা হয়, তদপেক্ষাও বেশী পণ্ডিত।” এই পত্রখানি এবং অধ্যাপক-প্রদত্ত একখানি টিকিট লইয়া স্বামীজি চিলাগো প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং নিষ্কিবাদে প্রতিনিধিরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

অবশেষে মহাসভা খুলিবার দিন সমাগত হইল, এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের শ্রেণীমধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভামঞ্চে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, কিন্তু সেই বিরাট শ্রোতৃসংঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র এক আকস্মিক উদ্বেগ তাঁহাকে অভিভূত করিল। অপর সকলে বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন; তাঁহার কিছুই ছিল না। সেই ছয় সাত সহস্র নরনারীর বিপুল সংঘকে তিনি বলিবেন কি? সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া তিনি তাঁহার পরিচয়ের পালা আসিলেই ক্রমাগত উহা পিছাইয়া দিতে লাগিলেন, প্রতিবারই সভাপতি মহাশয়ের কানে কানে বলিতে লাগিলেন, “আর কাহাকেও অগ্রে বলিতে দিন।” অপরাহ্নেও এইরূপ হইল। অবশেষে প্রায় পাঁচটার সময় ডাক্তার ব্যারোজ মহোদয় উঠিয়া তাঁহাকেই পুরবর্তী বক্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিলেন।

এই ঘোষণা বিবেকানন্দের স্নায়ুশূলীর স্থিরতা সম্পাদন করিয়া

তাঁহার সাহস উদ্বোধিত করিয়া দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লেটো-
পয়োগী কার্য্য করিবার জন্ত দণ্ডায়মান হইলেন। বক্তৃতা দিবার জন্ত
দণ্ডায়মান হওয়া, বিশেষতঃ বহু শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়া
তাঁহার জীবনে এই প্রথম, কিন্তু ফল হইল তাড়িত-শক্তির গায়।
সেই সাগরোপম সহস্র উৎসুক নরনারীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার
শক্তি ও বাগ্মিতা পূর্ণভাবে জাগরিত হইয়া উঠিল এবং তিনি তাঁহার
মুনিশ্চন্দী কণ্ঠে শ্রোতৃবর্গকে 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ'
বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সিদ্ধি সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার করতলগত
হইল, এবং যতদিন মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল ততদিন তাঁহার
আদির একদিনের জন্তও কমে নাই। সকলে বরাবর তাঁহার কথা
অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহারই বক্তৃতা শুনিবার
জন্ত গরমের দিনেও দীর্ঘ অধিবেশনের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন।

ইহাই তাঁহার যুক্তরাজ্যে কার্য্যের প্রারম্ভ। মহাসভার কার্য্য
শেষ হইলে স্বামীজির নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্ত একটি
বক্তৃতা-কোম্পানীর (Lecture Bureau) অনুরোধে তাহাদের পক্ষ
হইতে যুক্তরাজ্যের পশ্চিম অংশে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে স্বীকৃত হন।
বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেও তিনি শীঘ্রই এই
অপ্রীতিকর কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তিনি এখানে ধর্ম্মাচার্য্যরূপে
আসিয়াছেন, ঐহিক বিষয়ে সুবক্তা হিসাবে নহে। সুতরাং এটি
অতি লাভজনক ব্যাপার হইলেও তিনি শীঘ্রই উহা পরিত্যাগ
করিলেন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁহার প্রকৃত কার্য্যে হস্ত-
ক্ষেপ করিবার জন্ত নিউ ইয়র্কে আগমন করিলেন। চিকাগোর
অবস্থানকালে তাহাদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, প্রথমে

তঁাহাদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। তঁাহারা প্রধানতঃ ধনাঢ্য শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে তঁাহাদেরই বৈঠকখানায় বক্তৃতা করিতেন। কিন্তু ইহাও তঁাহার মনঃপূত হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি লোকের মনে যে অনুরাগ উৎপাদন করিয়াছেন, উহা তিনি যাহা চাহেন, তাহা নহে; উহা অত্যন্ত ভাসাভাসা জিনিষ, অতিমাত্রায় আমোদপ্রিয়তা মাত্র। এই জন্ত তিনি নিজের একটি স্থান নির্দ্ধারিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, যেখানে ধনী নির্ধন—সকল অনুরাগী সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে আসিতে পারিবেন।

ক্রকলীন নীতিসভার সমক্ষে একটি বক্তৃতায় তঁাহার এইরূপে নিজের ভাবের শিক্ষা দিবার পথ সুগম করিয়া দিল। এই সভার অধ্যক্ষ ডাক্তার লিউইস্ জি, জেন্স্ এই হিন্দু যুবা-সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন এবং তঁাহার ক্ষমতায় ও পশ্চিম-গোলার্দ্ধবাসী আমাদের নিকট তঁাহার উপদেশবাণী দ্বারা এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তঁাহাকে উক্ত সভার সমক্ষে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিন—নীতিসভার অধিবেশনগৃহ 'পাউচ্ প্রাসাদ' লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'হিন্দুধর্ম'। স্বামীজি যখন লম্বা আলখাল্লা ও পাগ্‌ড়ীতে সজ্জিত হইয়া তঁাহার মাতৃভূমির প্রাচীন ধর্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন লোকের আগ্রহ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, বক্তৃতান্তে ক্রকলীনে যাহাতে নিয়মিত ক্লাস হয়, তজ্জন্ত লোকে বিশেষ জেদ করিতে লাগিল। স্বামীজি অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে সম্মতি দিলেন এবং পাউচ্ প্রাসাদে ও অন্ততঃ কতকগুলি

নিয়মিত ক্লাসের অধিবেশন ও সর্বসাধারণসমক্ষে কতিপয় বক্তৃতা হইল।

ব্রুকলীনে যাহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন, তিনি নিউ-ইয়র্কের যে স্থানে বাস করিতেন, তথায় এই সময়ে যাইতে আরম্ভ করিলেন। একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীর তেতলায় সামান্য একটি ঘরে তিনি থাকিতেন, এবং ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া যখন তত্রত্য চৌকীখানি ও চেয়ারগুলিতে আর স্থান-সঙ্কুলান হইল না, তখন ছাত্রগণ কতক দেওয়ালের উপর, কতক কোণের মার্বেল পাথরের হাত-মুখ ধুইবার উচু জায়গায়, আর কতক বা মেঝেতেই বসিতে লাগিলেন। স্বামীজি নিজেও তাঁহার স্বদেশের প্রথামত মেঝেতেই আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আগ্রহবান্ শিষ্যগণকে বেদান্তের মহাসত্যগুলি শিক্ষা দিতেন।

এতদিনে তিনি বুঝিলেন যে, স্বীয় আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল ধর্মের সত্যতা ও মৌলিক একত্ব-প্রতিপাদক উপদেশবানী পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রচার করারূপ নিজ অভীক্ষিত মহাকাব্যো তিনি কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন। ক্লাসটি এত শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল যে, আর উপরের ছোট ঘরটিতে স্থান হয় না, সুতরাং নীচেকার বড় বৈঠকখানাদয় ভাড়া লওয়া হইল। এইখানেই স্বামীজি সেই ঋতুটির শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিনা বেতনে প্রদত্ত হইত; প্রয়োজনীয় ব্যয়, স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দান করিতেন, তাহাতেই চালাইবার চেষ্টা করা হইত। কিন্তু সংগৃহীত অর্থ ঘরভাড়া ও স্বামীজির আহাৰাদি ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ার অর্থাভাবে ক্লাসটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম

হইল। অমনি স্বামীজি ঘোষণা করিলেন যে, ঐহিক বিষয়ে তিনি সর্বসাধারণসমক্ষে কতকগুলি নিয়মিত বক্তৃতা দিবেন। ইহাদের জন্য পারিশ্রমিক লইতে তাঁহার বাধা ছিল না, সেই অর্থে তিনি ধর্মসম্বন্ধীয় ক্লাসটি চালাইতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দুদের চক্ষে শুধু বিনামূল্যে শিক্ষা দিলেই ধর্মব্যাখ্যার কর্তব্য শেষ হইল না, সম্ভবপর হইলে তাঁহাকে এই কার্যের ব্যয়ভারও বহন করিতে হইবে। পূর্বকালে ভারতে এমনও নিয়ম ছিল যে, উপদেষ্টা শিষ্যগণের আহার ও বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করিবেন।

ইতিমধ্যে কতিপয় ছাত্র স্বামীজির উপদেশে এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যাহাতে তাঁহারা পরবর্তী গ্রীষ্ম ঋতুতেও ঐ শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তজ্জন্ত সমুৎসুক হইলেন। কিন্তু তিনি একটি ঋতুর কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পুনরায় গ্রীষ্মের সময় ঐরূপ পরিশ্রম করা সম্বন্ধে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন। তারপর অনেক ছাত্র বৎসরের ঐ সময়ে সহরে থাকিবেন না। কিন্তু প্রশ্নটির আপনা আপনিই মীমাংসা হইয়া গেল। আমাদের মধ্যে একজনের সেন্টলরেন্স্ নদীবক্ষস্থ বৃহত্তম দ্বীপ 'সহস্র দ্বীপোত্তানে' (Thousand Island Park) একখানি ছোট বাড়ী ছিল; তিনি উহা স্বামীজির এবং আমাদের মধ্যে যত জনের উহাতে স্থান হয়, তত জনের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। এই ব্যবস্থা স্বামীজির মনঃপূত হইল; তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুর 'মেইন ক্যাম্প' (Maine Camp) নামক ভবন হইতে প্রত্যাগত হইয়াই আমাদের নিকট তথায় আসিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

যে ছাত্রীটি বাড়ীখানির অধিকারিনী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল, মিস্ ডাচার। তিনি বুঝিলেন যে, এই উপলক্ষে একটি পৃথক্ কক্ষ নির্মাণ করা আবশ্যিক—যেখানে কেবল পবিত্র ভাবই বিরাজ করিবে, এবং তাঁহার গুরুর প্রতি প্রকৃত ভক্তি-অর্ঘ্য হিসাবে আসল বাড়ীখানি যত বড়, প্রায় তত বড়ই একটি নূতন পার্শ্ব নির্মাণ করিয়া দিলেন। বাড়ীটি এক উচ্চভূমির উপর অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত ছিল; সুরম্য নদীটির অনেকখানি এবং উহার বহুদূরবিস্তৃত সহস্র দ্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। দূরে ক্রেটন অল্প অল্প দেখা যাইত, আর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বিস্তৃত ক্যানাডা উপকূল উত্তরে দৃষ্টি অবরোধ করিত। বাড়ীখানি একটি পাহাড়ের গারে অবস্থিত ছিল; পাহাড়টির উত্তর ও পশ্চিম দিক্ হঠাৎ ঢালু হইয়া নদীতীর ও উহারই যে ক্ষুদ্র অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আসিয়াছে, তাহার তীর পর্যন্ত গিয়াছে; শেষোক্ত জলভাগটি একটি ক্ষুদ্র হ্রদের দ্বারা বাড়ীখানির পশ্চাতে রহিয়াছে। বাড়ীখানি সত্য সত্যই (বাইবেলের ভাষায়) ‘একটি পাহাড়ের উপর নির্মিত,’ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উহার চারিদিকে পড়িয়াছিল। নবনির্মিত পার্শ্বটি পাহাড়ের খুব ঢালু অংশে দণ্ডায়মান থাকায় যেন একটি বিরাট বাতি ঘরের মত দেখাইত। বাড়ীটির তিন দিকে জানালা ছিল এবং উহা পিছনের দিকে ত্রিতল ও সামনের দিকে দ্বিতল ছিল। নীচের ঘরটিতে ছাত্রগণের মধ্যে একজন থাকিতেন; তাহার উপরকার ঘরটিতে বাড়ীখানির প্রধান অংশ হইতে অনেকগুলি দ্বার দিয়া যাওয়া যাইত, এবং প্রশস্ত ও সুবিধাজনক হওয়ায় উহাতেই আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত, এবং তথায়ই স্বামীজি অনেক ঘণ্টা

ধরিয়া আমাদের উপরিচিত বন্ধুর মত উপদেশ দিতেন। এই ঘরের উপরের ঘরটি শুধু স্বামীজিরই ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যাহাতে উহা সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব হইতে পারে, তজ্জন্ম মিস্ ডাচার বাহিরের দিকে একটি পৃথক সিঁড়ি করাইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য উহাতে দোতলার বারাণ্ডায় আসিবার একটি দরজাও ছিল।

এই উপরতলার বারান্দাটি আমাদের জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল; কারণ, স্বামীজির সকল সাক্ষ্য কথোপকথন এই স্থানেই হইত। বারান্দাটি প্রশস্ত থাকায় উহাতে কতকটা স্থান ছিল। উহার উপরে ছাদ দেওয়া ছিল, এবং উহা বাড়ীখানির দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে বিস্তৃত ছিল। মিস্ ডাচার উহার পশ্চিমাংশটি একটি পদ্দা দিয়া সম্বন্ধে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং যে সকল অপরিচিত ব্যক্তি এই বারান্দা হইতে তত্রত্য অপূর্ব দৃশ্যটি দেখিবার জন্ম তথায় প্রায়ই আগমন করিতেন, তাঁহারা আমাদের নিস্তরতা ভঙ্গ করিতে পারিতেন না। এইখানেই আমাদের অবস্থানকালের প্রতি সন্ধ্যায় আচার্য্যদেব তাঁহার দ্বারের সমীপে বসিয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা করিতেন। আমরাও সন্ধ্যায় স্তিমিত আলোকে নির্ঝাঁকু হইয়া বসিয়া বসিয়া তাঁহার অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে পান করিতাম। স্থানটি যেন সত্য সত্যই একটি পুণ্যনিকেতন ছিল। পাদনিম্নে হরিৎপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশীর্ষগুলি হরিৎসুন্দর মত আন্দোলিত হইত; কারণ, সমগ্র স্থানটি ঘন অরণ্যে পরিবৃত্ত ছিল। সুবৃহৎ গ্রামটির একখানি বাড়ীও তথ্য হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা যেন লোকালয় হইতে বহু যোজন দূরে কোন নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে বাস করিতাম। বৃক্ষশ্রেণী হইতে দূরে বিস্তৃত সেট্‌লমেন্ট নদী;

তদ্বন্ধে মাঝে মাঝে দ্বীপসমূহ ; উহাদের মধ্যে কর্তকগুলি আবার হোটেল ও ভোজনালয়ের উজ্জল আলোকে ঝিকমিক করিত । এই সকল এত দূরে বিস্তৃত ছিল যে, উহারা সত্য অপেক্ষা চিত্রিত দৃশ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইত । আমাদের এই নির্জন স্থানে জন-কোলাহলও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না । আমরা শুধু কীটপত-ঙ্গাদির অক্ষুট রব, পক্ষিগণের মধুর কাকলি, অথবা পত্রাভ্যন্তরচারী পবনের মৃদু মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে পাইতাম । দৃশ্যটির কিয়দংশ স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত, এবং নিম্নের স্থির জলরাশিবন্ধে দর্পণের গায় চন্দ্রের মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইত । এই গন্ধর্করাজ্যে আমরা আচার্য্যদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাঁহার অতীশ্রিত-রাজ্যের বার্তাসম্বিত অপূর্ব বচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে অতিবাহিত করিয়াছিলাম—তখন আমরাও জগৎকে ভুলিয়া গিয়া-ছিলাম, জগৎও আমাদেরকে ভুলিয়া গিয়াছিল । এই সময়ে প্রতিদিন সন্ধ্যাভোজন-সমাপনান্তে আমরা সকলে উপরকার বারান্দাটিতে গমন করিয়া আচার্য্যদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম । অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না ; কারণ, আমরা সমবেত হইতে না হইতেই তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া তাঁহার অভ্যন্ত আসন গ্রহণ করিতেন । তিনি আমাদের সহিত প্রত্যহ দুই ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল যাপন করিতেন । এক অপূর্বসৌন্দর্য্যাময়ী রজনীতে (সে দিন নিশানাথ প্রায় পূর্ণাবয়ব ছিলেন) কথা কহিতে কহিতে চন্দ্রাস্ত হইয়া গেল ; আমরাও যেমন কালক্ষেপের বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই, স্বামীজিও যেন ঠিক তদ্রূপই জানিতে পারেন নাই ।

এই সকল কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয় নাই ; তাহারা শুধু শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়েই গ্রথিত হইয়া আছে । এই সকল দিব্য অবসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্ম্মানুভূতিসকল লাভ করিতাম, তাহা আমাদের কেহই ভুলিতে পারিবে না । স্বামীজি ঐ সকল সময়ে তাঁহার হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দিতেন । ধর্ম্মলাভ করিবার জন্ত তাঁহাকে যে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেগুলি যেন পুনরায় আমাদের নেত্রগোচর হইত । তাঁহার গুরুদেবই যেন স্বল্পশরীরে তাঁহার মুখাবলম্বনে আমাদের নিকট কথা কহিতেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং সমুদয় ভয় দূর করিতেন । অনেক সময়ে স্বামীজি যেন আমাদের উপস্থিতিই ভুলিয়া যাইতেন ;—তখন আমরা পাছে তাঁহার চিন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়া ফেলি—এই ভয়ে যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া থাকিতাম । তিনি আসন হইতে উঠিয়া বারান্দাটির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেন । এই সকল সময়ে তিনি যেরূপ কোমল-প্রকৃতি ছিলেন এবং সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন, তেমন আর কখনও দেখা যায় নাই ; তাঁহার গুরুদেব যেরূপে তাঁহার শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হয়ত অনেকটা তদনুরূপই ব্যাপার—তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাবমুখে কথা কহিয়া যাইতেন, আর শিষ্যগণ শুধু শুনিয়া যাইতেন ।

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা । প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সেই একই ভাব—আমরা এক ঘনীভূত ধর্ম্মভাবের রাজ্যে

বাস করিতাম। স্বামীজি মধ্যে মধ্যে বালকের ছায়া ক্রীড়াশীল ও কৌতুকপ্রিয় হইলেও এবং সোল্লাসে পরিহাস করিতে ও কথার চোটপাট জবাব দিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, কখন মুহূর্তের জন্ত তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেন না। প্রতি জিনিষটি হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথবা উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন, এবং এক মুহূর্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন। স্বামীজি পৌরাণিক গল্পসমূহের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন আর্ষ্যগণের মত আর কোন জাতির মধ্যেই এত অধিক পরিমাণে পৌরাণিক গল্পের প্রচলন নাই। তিনি আমাদিগকে ঐ সকল গল্প শুনাইয়া প্রীতি অনুভব করিতেন এবং আমরাও শুনিতে ভালবাসিতাম। কারণ, তিনি কখনও এই সকল গল্পের অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে এবং উহা হইতে মূল্যবান ধর্মবিষয়ক উপদেশ আবিষ্কার করিয়া দিতে বিশ্বস্ত হইতেন না। কোন ভাগ্যবান ছাত্রমণ্ডলী একরূপ প্রতিভাবান্ আচার্য্যানাভে আপনাদিগকে ধন্ত জ্ঞান করিবার এমন সুযোগ পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

আশ্চর্য্য কাকতালীয় ছায়ে ঠিক দ্বাদশ জন ছাত্রী ও ছাত্র 'সহস্র দ্বীপোষ্ঠানে' স্বামীজির অনুগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদিগকে প্রকৃত শিক্ষারূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং সেই জন্তই তিনি আমাদিগকে একরূপ দিবারাত্র প্রাণ খুলিয়া, তাঁহার নিকট যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল, তাহাই শিক্ষা দিতেন। এই বার জনের সকলেই এক সময়ে একত্র

হন নাই, উর্ধ্বসংখ্যায় দশ জনের অধিক কোন সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। আমাদের মধ্যে দুইজন পরে ‘সহস্র দ্বীপোদ্ভানেই’ সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ন্যাসের সময় স্বামীজি আমাদের পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্যাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট কয়েকজন পরে নিউ-ইয়র্ক নগরে স্বামীজির তত্রত্য অপর কয়েকজন শিষ্যের সহিত একসঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

‘সহস্র দ্বীপোদ্ভানে’ গমনকালে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, আমরা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া একযোগে বাস করিব; প্রত্যেকেই গৃহকর্মের নিজ নিজ অংশ সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে কোন বাজে লোকের সংস্পর্শে আমাদের গৃহের শান্তিভঙ্গ হইতে পারিবে না। স্বামীজি স্বয়ং একজন পাকা রাঁধুনী ছিলেন, এবং আমাদের জন্ত প্রায়ই উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার গুরুদেবের দেহান্তের পরে যখন তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সেবা করিতেন, সেই সময়েই তিনি রন্ধনকার্য্য শিখিয়াছিলেন। এই যুবকগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া যাহাতে তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচারিত সত্যসমূহ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া দিবার উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে তাঁহার গুরুদেবকর্তৃক আরম্ভ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার ভার তাঁহারই উপর পড়িয়াছিল।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্য্যগুলি শেষ হইবামাত্র (অনেক সময়ে তাহার পূর্বেই) স্বামীজি আমাদের কাছে, যে বৃহৎ বৈঠকখানাটিতে আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত তথায় সমবেত করিয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিতেন। প্রতিদিন তিনি

আমেরিকায় স্বামীজি

কোন একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করিয়া লইয়া তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উপনিষৎ বা ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্র প্রভৃতি কোন ধর্মগ্রন্থ লইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। বেদান্তসূত্রে বেদান্তান্তর্গত মহাসত্যগুলি যতদূর সম্ভব স্বল্পাকারে নিবদ্ধ আছে তাহাদের কর্তা ক্রিয়া কিছুই নাই এবং সূত্রকারগণ প্রত্যেক অনাবশ্যক পদ পরিহার করিতে এত আগ্রহান্বিত থাকিতেন যে, হিন্দুগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে,—সূত্রকার বরং তাঁহার একটি পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার সূত্রে একটি অতিরিক্ত অক্ষরও বসাইতে প্রস্তুত নহেন।

অত্যন্ত স্বল্পাকার—প্রায় হেঁয়ালির মত বলিয়া বেদান্তসূত্র-গুলিতে ভাষ্যকারগণের মাথা খাটাইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে, এবং শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব, এই তিন জন হিন্দু মহাদার্শনিক উহাদের উপর বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছেন। প্রাতঃকালের কথোপকথনগুলিতে স্বামীজি প্রথমে এই ভাষ্যগুলির কোনও একটি লইয়া, তৎপরে আর একটি এইরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, এবং দেখাইতেন, কিরূপে প্রত্যেক ভাষ্যকার তাঁহার নিজ মতানুযায়ী সূত্রগুলির কদর্থ করার অপরাধে অপরাধী, এবং যাহা তাঁহার নিজ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করিবে, নিঃসঙ্কোচে সেইরূপ অর্থই সেই সূত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছেন! জোর করিয়া মূলের বিকৃতার্থ করারূপ কদভ্যাস কত পুরাতন, তাহা স্বামীজি আমাদেরকে প্রায়ই দেখাইয়া দিতেন।

কাজেই এই কথোপকথনগুলিতে কোন দিন বা মধ্ববর্ণিত গুরু দ্বৈতবাদ, আবার কোন দিন বা রামানুজ-প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যাত হইত। কিন্তু শঙ্করের অদ্বৈতমূলক ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্ষা

অধিক ব্যাধীত হইত। তবে শংকরের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চুলুচে বিচার আছে বলিয়া উহা সহজবোধ্য ছিল না, সুতরাং শেষ পর্য্য রামানুজই ছাত্রগণের মনের মত ব্যাখ্যাকার রহিয়া যাইতেন।

কখনও কখনও স্বামীজি নারদীয় ভক্তিসূত্র লইয়া ব্যাখ্য করিতেন। এই সূত্রগুলিতে ঈশ্বরভক্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে এবং উহা পাঠ করিলে কথঞ্চিৎ ধারণা হয়—হিন্দুদের প্রকৃত, সর্বগ্রাসী, আদর্শ ঈশ্বরপ্রেম কিরূপ—সে প্রেম সত্য সত্যই সাধকের মন হইতে অপর সমুদয় চিন্তা দূর করিয়া তাহাকে ভূতে পাওয়ার মত পাইয়া বসে! হিন্দুগণের মতে ভক্তি ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্যভাব লাভ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়; এ উপায় ভক্তগণের স্বভাবতঃই ভাল লাগে। ঈশ্বরকে—কেবল তাঁহাকেই—ভালবাসার নামই ভক্তি।

এই কথোপকথনগুলিতেই স্বামীজি সর্বপ্রথম আমাদের নিকট, তাঁহার মহান্ আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন,—কিরূপে স্বামীজি দিনের পর দিন তাঁহার সহিত কাল কাটাইতেন এবং কিরূপে তাঁহাকে নিজ নাস্তিক মতের দিকে ঝাঁক দমন করিবার জন্ত কঠোর চেষ্টা করিতে হইত এবং উহা যে সময়ে সময়ে তাঁহার গুরুদেবকে সন্তোষিত করিয়া তাঁহাকে কাঁদাইয়াও ফেলিত—এই সকল কথা বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অপর শিষ্যগণ প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ঠাণ্ডাদিগকে বলিতেন, স্বামীজি একজন মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁহার কার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিবার জন্ত আগমন করিয়াছেন এবং তিনি কে, তাহা জানিবামাত্র শরীর ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আরও

বলিতেন যে, উক্ত সময় উপস্থিত হইবার পূর্বে স্বামীজিকে শুধু ভারতেরই কল্যাণের জ্ঞান নহে, কিন্তু অপর দেশসমূহের জ্ঞানও কোনও একটি বিশেষ কার্য্য করিতে হইবে। তিনি প্রায়ই বলিতেন, “বহুদূরে আমার আরও সব শিষ্য আছে ; তাহারা এমন সব ভাষায় কথা কহে, যাহা আমি জানি না।”

‘সহস্র দ্বীপোত্তানে’ সাত সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়া স্বামীজি নিউ-ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরে অন্তত্ৰ ভ্রমণে বাহির হইলেন। নভেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিতে এবং ছাত্রগণকে লইয়া ক্লাস করিতে লাগিলেন। তৎপরে নিউ-ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় পুনরায় ক্লাস আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ছাত্রগণ জনৈক উপযুক্ত সাঙ্কেতিক লিখনবিৎকে (stenographer) সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে স্বামীজির উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই ক্লাসের বক্তৃতাগুলি কিছুদিন পরেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকগুলি ও পুস্তিকাকারে নিবদ্ধ তাঁহার সাধারণসমক্ষে বক্তৃতাগুলিই আজি স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় প্রচারকার্য্যের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে বর্তমান রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে যাহারা এই বক্তৃতাগুলিতে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলিতে স্বামীজিকে যেন আবার সজীব বোধ হয় এবং তিনি যেন তাঁহাদিগের সহিত কথা কহিতেছেন, এইরূপ মনে হয়। তাঁহার বক্তৃতাগুলি যে একরূপ যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তজ্জন্ম কৃতিত্ব একজনের—যিনি পরে স্বামীজীর একজন মহা অনুরাগী ভক্ত

হইয়াছিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েরই কার্য নিষ্কাম প্রেম-
প্রসূত ছিল, সুতরাং ঐ কার্যের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ
বর্ধিত হইয়াছিল।

এস, ই, ওয়াল্ডে

নিউ-ইয়র্ক ১৯০৮

আচার্য্যদেব

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমার স্মৃতিপটে অশ্রুত দিন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পবিত্র দিবস হইয়া রহিয়াছে ; কারণ ঐ দিনেই আমি সর্বপ্রথম সেই মহাপুরুষ, সেই ধর্ম-জগতের মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি দর্শন ও তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করি, যিনি দুই বৎসর পরে আমার শিষ্যপদে বরণ করিয়া অপার আনন্দ ও বিশ্বয়ে অভিভূত করিয়াছিলেন। তিনি এই দেশের (আমেরিকার) বড় বড় নগরগুলিতে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং ডিট্রয়েটের ইউনিটেরিয়ান চার্চে তিনি যে সকল ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন, তাহার প্রথমটি উক্ত দিবসে প্রদত্ত হয়। জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, সুরহং প্রাসাদটিতে সত্য সত্যই তিলাঙ্ক স্থান ছিল না, এবং স্বামীজি তথায় রাজসম্মানে সম্মানিত হন। যখন তিনি বক্তৃতামঞ্চে পদার্পণ করিলেন, তাঁহার তখনকার সেই রাজশ্রীমণ্ডিত মহিমময় মূর্তি যেন এখনও আমার নয়নগোচর হইতেছে। উহা যেন অসীম শক্তির আধার এবং মুহূর্ত্তেই সকলের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইতেছে ! আর তাঁহার সেই অপূর্ব কণ্ঠনিঃসৃত প্রথম শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র—শব্দ নয়, যেন সঙ্গীত—এই বীণার ত্রায় করুণ রাগিণীতে বাজিতেছে, এই আবার গম্ভীর, শকময়, আবেগময় হইয়া বন্ধার দিতেছে—সমস্ত সভা নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল—সে নিস্তব্ধতা যেন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল—এবং সেই বিপুল জনসংঘ শ্রবণাকাজ্জ্বল্য শ্বাসরুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

স্বামীজি ঊর্ধ্বায় সর্বসমক্ষে পাঁচটি বক্তৃতা দেন। তিনি শ্রোতৃ-বর্গকে মন্থমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন, কারণ, তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের উপর অসাধারণ অধিকার ছিল, এবং তিনি এমন ভাবে কথা কহিতেন, যেন তিনি “চাপরাস” পাইয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত যুক্তিগুলি কখনও ন্যায়বিরুদ্ধ হইত না, উহাতে তৎকথিত সিদ্ধান্তগুলির সত্যতার উপর দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করিয়া দিত, আর বক্তৃতার অতি উৎকৃষ্ট অংশেও তিনি কদাপি ভাববশে চালিত হইয়া, যে সত্যটি তিনি লোকের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতে প্রয়াস করিতেছিলেন, সেই মূল বক্তব্যটি হারাইয়া ফেলিতেন না।

তিনি নির্ভীকভাবে তাঁহার অননুমোদিত ধর্ম বা দর্শনের সিদ্ধান্তগুলির প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে লোকে স্বতঃই বুঝিতে পারিত যে, এ ব্যক্তির হৃদয় এত মহৎ যে উহা লোকের দোষ ও দুর্বলতার দিকে না দেখিয়া সমুদয় বিশ্বকে আপনার বুকে টানিয়া লইতে পারে; ইনি লোকের অত্যাচার সহ্য করিতে ও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে কখনও পরাজয় হইবেন না। বাস্তবিকই, পরে আমার তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ ঘটিলে আমি দেখিয়াছি, তিনি সত্য সত্যই মানুষের যতদূর সাধ্য ততদূর ক্ষমা করেন। আহা, কি অপরিসীম ভালবাসা ও ধৈর্যের সহিত তিনি তাঁহার সমীপাগত লোকদিগকে তাহাদের নিজ নিজ দুর্বলতার গোলকধাঁধা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, তাহাদিগকে ‘কাঁচা আমি’র গণ্ডি অতিক্রম করাইয়া ঈশ্বরলাভের মার্গ নির্দেশ করিয়া দিতেন! তিনি ঈর্ষা বলিয়া কিছু জানিতেন না। যদি কেহ তাঁহাকে গালি দিত, তিনি গম্ভীর হইয়া যাইতেন, “শিব শিব”

বলিতে বলিতে তাঁহার বদন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, আর তিনি বলিতেন, “ইহা ত শুধু প্রিয়তম প্রভুরই বাণী !” অথবা আমাদের মধ্যে যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত, তাহারা যদি এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইত তাহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, “যে নিন্দাস্বতীর কর্তা ও পাত্র উভয়কেই এক বলিয়া জানে, তাহার নিকট ইহাতে কি আসিয়া যায় ?” আবার ঐ সকল স্থলে তিনি, শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহাকে কেহ গালি দিলে বা কটু কথা বলিলে তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না, তৎসম্বন্ধে কোন এক গল্প বলিতেন। তিনি বুঝাইতেন, ভাল মন্দ সকল বস্তুই, সকল দ্রব্যই “আদরিণী শ্যামা মায়ের” নিকট হইতে আসিয়া থাকে।

কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল, এবং একটি দিনের জগুও আমি তাঁহার চরিত্রে এতটুকু দাগ দেখিতে পাই নাই। মানবের ক্ষুদ্র দুর্বলতাগুলি তাঁহাতে স্থান পাইত না ; আর যদি বিবেকানন্দের কোন দোষ থাকিত, তবে উহা নিশ্চয়ই উদার ভাবের দোষ হইত। এত বড় হইয়াও তিনি বালকের মত সরল ছিলেন ; ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত যেমন দরিদ্র ও পতিত লোকদিগের সহিতও তিনি ঠিক তেমনই ভাবে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেন।

ডিট্রয়েটে অবস্থানকালে তিনি মিশিগ্যানের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার বিধবা পত্নী মিসেস্ জন্ জে, ব্যাগ্লির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা রমণী অতি বিরল, ইহার ধর্ম্মভাবও অসাধারণ ছিল। ইনি আমাকে বলিয়াছেন যে, স্বামীজি যতদিন (প্রায় একমাস কাল) তাঁহার গৃহে অতিথি ছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার

কথায় ও কার্যে একক্ষণের জ্ঞানও অতি উচ্চদরের ভাব ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশ পাইত না, এবং তাঁহার অবস্থানে গৃহ যেন অবিরত মঙ্গল প্রবাহে পূর্ণ থাকিত। মিসেস্ ব্যাগ্‌লির গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অনারেবল্ টমাস ডবলিউ, পাম্বারের অতিথিক্রমে একপক্ষ কাল বাস করেন। মিঃ পাম্বার জাগতিক মহামেলা বৈঠকের (World's Fair Commission) অধ্যক্ষ ছিলেন ; ইনি পূর্বে স্পেনদেশে যুক্তরাজ্যের রাজদূতস্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং যুক্তরাজ্যের মহাসভার একজন সভ্যও (Senator) ছিলেন। এই ভদ্রলোক এখনও জীবিত আছেন এবং ইহার বয়স অশীতি বর্ষেরও অধিক হইয়াছে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই বলিতে পারি যে, আমি যে কয়েক বৎসর ধরিয়া স্বামীজির সহিত পরিচিত ছিলাম, তন্মধ্যে আমি তাঁহাকে কদাপি আদর্শে ও কার্যে উচ্চতম ভাব ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশ করিতে দেখি নাই।

আহা ! স্বামীজি কত লোকের ভালবাসাই না আকর্ষণ করিয়াছেন ! মানুষ যে তাঁহার মত এত অমলধবল, এত নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে, তাহা আমি ধারণায়ও আনিতে পারিতাম না ! উহাই তাঁহাকে অন্য সকল মানব হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ রূপলাবণ্যসম্পন্ন রমণীগণের সংসর্শে আসিয়াছিলেন, কিন্তু শুধু সৌন্দর্য্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিত না। তবে তিনি প্রায়ই বলিতেন, “আমি তোমাদের তীক্ষ্ণী বিহীনগণের সহিত তর্কযুক্ত করিতে চাই, আমার পক্ষে উহা একটি অভিনব ব্যাপার ; কারণ, আমার দেশে নারীগণ অধিকাংশ স্থলেই অস্ত্রপূরচারিণী !”

তাঁহার চালচলন বালকসুলভ সরলতাময় ছিল। এবং লোককে অতিশয় মুগ্ধ করিত। আমার মনে আছে, একদিন তিনি অদ্বৈতানুভূতির পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করিয়া একটি অতি চিত্তগ্রাহিনী বক্তৃতা দিয়াছেন; পরক্ষণেই দেখিলাম, তিনি সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি একটা কিছুর কিনারা করিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়াছেন। লোকে উপর নীচে যাতায়াত করিতেছে—কেহ গাত্রবস্ত্র আনিবার জন্ত, কেহ অল্প কিছুর জন্ত। সহসা তাঁহার আনন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, “বুঝিয়াছি! উপরে উঠিবার সময় পুরুষেরা স্ত্রীলোকের আগে যান; আর নীচে নামিবার সময় স্ত্রীলোক পুরুষের আগে আসে, নয় কি?” তাঁহার প্রাচ্য শিক্ষাদীক্ষার ফলস্বরূপ, তিনি আচার-মর্যাদা-লংঘনকে আতিথেয়ই নিয়মভঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

যাঁহার তাঁহার জীবনের সংকল্পিত কার্য্যগুলিতে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি আমাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্ব হওয়া একান্ত আবশ্যিক। একজন শিষ্যা সম্বন্ধে তিনি অনেক আশা পোষণ করিতেন। তাঁহার মধ্যে ভাবী ত্যাগ-বৈরাগ্যের বিশিষ্ট পরিচয় তিনি নিশ্চয়ই পাইয়া থাকিবেন। একদিন তিনি আমাকে একাকী পাইয়া, তিনি কিরূপ জীবন যাপন করেন ও কিরূপ লোকের সঙ্গে মিশেন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন, এবং আমি সে সকলগুলিরই উত্তর দিবার পর তিনি আমার দিকে অতি আগ্রহাঘিতভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর তিনি খুব শুদ্ধসত্ত্ব, না?” আমি শুধু বলিলাম, “হাঁ স্বামীজি,

সম্পূর্ণ শুদ্ধস্ব।” তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার চক্ষু হইতে দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল, তিনি সোৎসাহে বলিলেন, “আমি ইহা জানিতাম, আমি ইহা অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার কলিকাতার কার্যের জ্ঞান আমি তাঁহাকে চাই।” তৎপরে তিনি ভারতীয় নারীকুলের উন্নতিকল্পে তাঁহার সংকল্পিত কার্যপ্রণালীর কথা এবং ঐ বিষয়ে তিনি যে সকল আশা পোষণ করেন তাহার কথা কহিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, “তাঁহাদের চাই শিক্ষা; আমরাদিগকে কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।” তথায় পরে একটি বালিকা-বিদ্যালয় সিষ্টার নিবেদিতা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, আর উক্ত শিক্ষাটিও তাঁহার সহিত উক্ত কার্যে যোগদান করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় একটি গলিতে বাস করেন, সাদী পরেন, এবং যথাসাধ্য বালিকাগণকে মাতার ন্যায় সেবায়ত্ত করেন। স্বামীজির সহিত আমার প্রথম পরিচয়কালে তিনি আমার সঙ্গিনী ছিলেন, কারণ আমরা উভয়ে একত্রে আচার্য্যদেবকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আমরাদিগকে শিক্ষা দিবার জ্ঞান তাঁহাকে অনুরোধ করি। সেই শীতকালটিতে তিনি ডিট্রয়েটের সকল লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিতমহলে তাঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং লোকে তাঁহার সহিত কথা কহিবার জ্ঞান সুযোগ খুঁজিত। দৈনিক সংবাদপত্রগুলি তাঁহার গতিবিধির সংবাদ রাখিতে লাগিল। একখানি কাগজে গম্ভীরভাবে উল্লিখিত হইল যে, খুব মরিচের গুঁড়া দেওয়া রুটি মাখনই তাঁহার প্রাতরাশ। রাশি রাশি চিঠি ও নিমন্ত্রণপত্র আসিতে লাগিল এবং ডিট্রয়েট বিবেকানন্দের পদানত হইল।

ডিট্রয়েট তাঁহার বরাবর প্রিয় ছিল এবং তাঁহার প্রতি এই সমস্ত সদয় ব্যবহারের জন্য তিনি সদাই কৃতজ্ঞ ছিলেন। আমাদের সে সময়ে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার কোন সুযোগ ছিল না, কিন্তু আমরা তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া যাইতে এবং যাহা শুনিতাম, মনে মনে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলাম। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প ছিল যে, কোন সময়ে, কোথাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবই করিব, যদি আমাদের তজ্জন্ম সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিতে হয়, তাহাও স্বীকার। প্রায় দুই বৎসর আমরা তাঁহার কোনও খোঁজ পাইলাম না, এবং মনে করিলাম, হয় ত তিনি ভারতে ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু একদিন অপরাহ্নে একজন বন্ধু আমাদের সংবাদ দিলেন যে, তিনি এখনও এই দেশেই আছেন এবং গ্রীষ্মকালটি 'সহস্র দ্বীপোষ্ঠানে' যাপন করিতেছেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিব, এই দৃঢ় সংকল্প লইয়া আমরা পরদিন প্রাতে যাত্রা করিলাম।

অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি জনকোলাহল হইতে দূরে আসিয়া বাস করিতেছেন, এমত অবস্থায় তাঁহার শান্তিভঙ্গ করিবার দুঃসাহস করিয়াছি, এই ভাবিয়া আমরা যারপর নাই ভীত হইলাম; কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের মধ্যে এমন এক আশ্বন ছালিয়াছেন, যাহা নির্দোষিত হইবার নহে। এই অদ্ভুত ব্যক্তি ও তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধে আমাদের আরও জানিতে হইবেই হইবে। সে দিন অন্ধকারময়ী রজনী, রূপ রূপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আবার আমরাও দীর্ঘ পথ-ভ্রমণে প্রাপ্ত, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের

মনে শান্তি নাই। তিনি কি আমাদেরকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন? আর যদি না করেন, তবে আমাদের উপায়? আমাদের হঠাৎ মনে হইল যে, এক ব্যক্তি, যিনি আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুশত ক্রোশ চলিয়া আসা হয়ত বা মূৰ্খতার কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু সেই অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা কষ্টে-কষ্টে পাহাড়টি চড়াই করিতে লাগিলাম; সঙ্গে একজন লণ্ঠনধারী লোক, তাহাকে আমরা পথ দেখাইয়া দিবার জন্য ভাড়া করিয়া-ছিলাম। পরে এই ঘটনা-প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব আমাদেরকে এইরূপে অভিহিত করিতেন, “আমার শিষ্যদ্বয়, যাহারা শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা রাত্রি কালে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া আসিয়াছিলেন।” তাঁহাকে কি বলিব, পূৰ্ব্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু যেমন আমরা বুঝিলাম যে, সত্য সত্যই আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, অমনি আমরা সেই সব ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতা ভুলিয়া গেলাম, আর আমাদের মধ্যে একজন কোন মতে অশ্রুটস্বরে বলিতে পারিল, “আমরা ডিট্রয়েট হইতে আসিতেছি এবং মিসেস্ প—আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।” আর একজন বলিলেন, “ভগবান জৈশা এখনও পৃথিবীতে বর্তমান থাকিলে যেসকল আমরা তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উপদেশ ভিক্ষা করিতাম, আমরা আপনার নিকট সেইরূপই আসিয়াছি।” তিনি আমাদের দিকে অতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, “শুধু যদি আমার ভগবান খ্রীষ্টের দ্বারা তোমাদেরকে এই মুহূর্ত্তে মুক্ত করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিত!” ক্ষণেকের জন্য তিনি চিন্তামগ্নভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং পরে

গৃহস্থামিনীকে (তিনি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন) বলিলেন, “এই মহিলাদ্বয় ডিট্রয়েট হইতে আসিতেছেন, ইহাদিগকে উপরে লইয়া যান, ইংহারা এই সঙ্ক্যাটি আমাদের সহিত অতিবাহিত করিবেন।” আমরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আচার্য্যদেবের কথা শুনিতে লাগিলাম। তিনি আমাদের প্রতি আর কোন মনোযোগ দিলেন না, কিন্তু আমরা সকলের নিকট বিদায় লইবার সময় তিনি আমাদের পক্ষে পরদিন নয়টার সময় আসিতে বলিলেন। আমরা কাল বিলম্ব না করিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং আচার্য্যদেবও আমাদের গ্রহণ করিয়া তথায় স্থায়িতাবে বাস করিবার জ্ঞতা সময়ে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন আমাদের কি আনন্দ!

আমাদের তথায় অবস্থান সম্বন্ধে আর একজন শিষ্যা বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন। আমি শুধু এইটুকু বলিব যে, সে গ্রীষ্মকালটি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেই কাটিয়াছিল। এই সময়ে তিনি যেমন ছিলেন, এমনটি তাঁহাকে আর কখন দেখি নাই। এখানে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত বলিয়া তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যও অতি সুন্দরভাবেই বিকাশ পাইয়াছিল।

আমরা তথায় বার জন ছিলাম, এবং বোধ হইতেছিল, যেন জ্বালাময়ী ঐশী শক্তি (Pentecostal fire) অবতরণ করিয়া পুরাকালে খ্রীষ্টশিষ্যগণের ন্যায় আচার্য্যদেবকেও স্পর্শ করিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে ত্যাগমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে গৈরিকবসনধারী যতিগণের আনন্দ ও স্বাধীনতার বর্ণনা করিতে করিতে সহসা তিনি উঠিয়া গেলেন, এবং অল্পক্ষণেই ত্যাগবৈরাগ্যের চরম-সীমান্তরূপ “Song of the Sannyasin” (সন্ন্যাসীর গীতি) শীর্ষক কবিতাটি লিখিয়া

ফেলিলেন। আমার মনে হয়, তাঁহার অপরিমিত ধৈর্য ও কোমলতাই আমাকে ঐ কালে সর্কাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছিল। পিতা তাঁহার সন্তানদের যে চক্ষে দেখেন, তিনিও আমাদের সেই চক্ষে দেখিতেন— যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। প্রাতঃকালের ক্লাসের কথোপকথনগুলি শুনিয়া সময়ে সময়ে আমাদের মনে হইত, যেন তিনি ব্রহ্মকে কرامলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমন সময়ে হয়ত তিনি সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেন এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন, “এখন আমি তোমাদের জন্ম রক্ষন করিতে যাইতেছি।” আর কত ধৈর্যের সহিত তিনি উনানের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের জন্ম কোন কিছু ভারতীয় আচার্য্য প্রস্তুত করিতেন! ডিট্রয়েটে আমাদের সহিত শেষবার অবস্থানকালে তিনি একদিন আমাদের জন্ম অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য জগদ্বিখ্যাত বিবেকানন্দ শিষ্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবগুলি নিজ হস্তে পূরণ করিয়া দিতেছেন—শিষ্যগণের পক্ষে কি অপূর্ব উদাহরণ! তিনি ঐ সকল সময়ে কত কোমল, কত করুণস্বভাব হইতেন! কত কোমলতাময় পূণ্যস্মৃতিই না তিনি আমাদেরকে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন!

একদিন স্বামীজি আমাদেরকে একটি গল্প বলিলেন—এই গল্পটিই তাঁহার জীবনে সর্কাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শেষবে দাতার মুখে তিনি উহা বারবার শুনিয়াছিলেন, এবং বার বার শুনিয়াও তাঁহার কখনও বিরক্তি বোধ হইত না। যতদূর সম্ভব তাঁহার নিজের ভাষাতে উহা আমি এখানে উল্লেখ করিতেছি :—

এক বিধবা ব্রাহ্মণীর একটি সন্তান ছিল। ব্রাহ্মণী অত্যন্ত দরিদ্রা ছিলেন, আর পুত্রটি অতি অল্পবয়স্ক ছিল—শিশু বলিলেই হয়। ব্রাহ্মণের সন্তান, সুতরাং তাহাকে লেখা-পড়া শিখাইতেই হইবে। কিন্তু কিরূপে উহা সম্ভব হয়? দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর যে গ্রামে বাস তথায় কোন শিক্ষক ছিল না, সুতরাং বালককে শিক্ষালাভ করিবার জন্ত নিকটবর্তী গ্রামে যাইতে হইত, এবং তাহার জননী অত্যন্ত দরিদ্রা থাকায় তাহাকে তথায় হাঁটিয়া যাইতে হইত। গ্রামদ্বয়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল, এবং বালককে উহা অতিক্রম করিতে হইত। সকল উচ্চ প্রধান দেশের গায় ভারতেও খুব প্রাতে এবং পুনরায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, দিবসের গ্রীষ্মাধিক্যে কোন কাজ হয় না। সুতরাং বালকের পাঠশালা যাইবার সময় এবং পুনরায় বাড়ী ফিরিবার সময় রোজই অল্প অল্পকার থাকিত। আমাদের দেশে যাহাদের সঙ্গতি নাই, তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষা বিনামূল্যে দেওয়া হয়, সুতরাং বালক বিনাব্যয়ে এই গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িতে পাইল, কিন্তু তাহাকে জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হইত এবং সঙ্গে কেহ না থাকায় সে মহা ভয় পাইত। একদিন বালক তাহার মাতার নিকট বলিল, “আমাকে প্রত্যহ ঐ ভয়ঙ্কর বনের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, আমার ভয় পায়। অণু ছেলেদের সঙ্গে চাকর যায়, তাহারা তাহাদের দেখে শোনে, আমার সঙ্গে যাইবার জন্ত কেন একটি চাকর থাকিবে না?” উত্তরে মাতা বলিলেন, “বাবা, দুঃখের কথা কি বলিব, আমি যে বড় গরিব, আমার যে তোমার সঙ্গে চাকর দিবার সঙ্গতি নাই।” ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, “তাহা হইলে আমি কি করিব?” মাতা বলিলেন, “বলিতেছি। এক

কাজ কর—ঐ বনে তোমার রাখাল-দাদা কৃষ্ণ আছেন (ভারতে শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম “রাখাল-রাজ”), তাঁহাকে ডাকিও, তাহা হইলে তিনি আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং তুমিও আর একা থাকিবে না।” বালক পরদিনও সেই বনে প্রবেশ করিল এবং ডাকিতে লাগিল, “রাখাল-দাদা, রাখাল-দাদা, তুমি এখানে আছ কি ?” এবং শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে, “হাঁ, আছি।” বালক সাস্তুনা পাইল এবং আর কখনও ভয় করিত না। ক্রমে সে দেখিতে লাগিল, তাহারই বয়সী এক বালক বন হইতে বাহির হইয়া তাহার সহিত খেলা করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। ছেলেটির মনে আর দুঃখ রহিল না। কিছুদিন পরে গুরুমহাশয়ের পিতৃবিয়োগ হইল, এবং ভারতের প্রথা মত তদুপলক্ষে একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান হইল। সেই সময়ে সকল ছাত্রকেই গুরুমহাশয়কে কিছু কিছু উপহার দিতে হয়, সুতরাং দরিদ্র বালক তাহার মাতার নিকট গিয়া বলিল, “মা, অল্প ছেলেদের মত আমিও গুরুমহাশয়কে কিছু উপহার দিব, আমাকে কিছু কিনিয়া দাও।” কিন্তু জননী বলিলেন যে, তিনি নিতান্ত দরিদ্র। তাহাতে বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “আমার উপায় ?” শেষে মাতা বলিলেন, “রাখাল-দাদার কাছে গিয়া তাঁহার নিকট চাও।” ইহা শুনিয়া বালক বনের মধ্যে গিয়া ডাকিল, “রাখাল-দাদা, গুরুমহাশয়কে উপহার দিবার জন্য তুমি আমাকে কিছু দিবে কি ?” অমনি তাহার সম্মুখে একটি দুগ্ধভাণ্ড উপস্থিত হইল। বালক কৃতজ্ঞমনে ভাণ্ডটি গ্রহণ করিল এবং গুরুমহাশয়ের গৃহে গিয়া এককোণে দাঁড়াইয়া, ভৃত্যগণ তাহার উপহারটি গুরুমহাশয়ের নিকট লইয়া যাইবে, এইজন্য অপেক্ষা

করিতে লাগিল। কিন্তু অল্প উপঢৌকনগুলি এত জাঁকজমকপূর্ণ ও চমৎকার ছিল যে, চাকরেরা তাহার দিকে খেয়ালই দিল না। তাহাতে সে মুখ ফুটিয়া কহিল, “গুরুমহাশয়, এই আমি আপনার জন্ম উপহার আনিয়াছি।” গুরুমহাশয় মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, উপহার অতি সামান্য, নগণ্য সামগ্রী, এবং অবজ্ঞাভরে ভৃত্যকে বলিলেন, “এ যখন ইহা লইয়া এত চেষ্টামেচি করিতেছে, তখন দুখটা একটা পাত্রে ঢালিয়া লইয়া উহাকে বিদায় কর।” ভৃত্য ভাঙুটি লইয়া দুখটুকু একটি বাটীতে ঢালিল, কিন্তু সে ভাঙুটি নিঃশেষ করিতে না করিতে উহা আবার পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে উহাকে শূন্য করিতে পারিল না। তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ কি ব্যাপার? এ ভাঙু তুমি কোথায় পাইলে?” ছেলোট উত্তর দিল, “রাখাল-দাদা আমাকে বনে উহা দিয়াছেন।” তাহার সকলে বলিয়া উঠিল, “বল কি! তুমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছ, আর তিনি উহা তোমাকে দিয়াছেন?” বালক বলিল, “হাঁ, এবং তিনি আমার সহিত প্রত্যহ খেলা করেন, এবং আমি পাঠশালার আসিবার সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে আসেন।” সকলে বিস্মিত হইয়া বলিল, “বল কি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বেড়াও, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেল?” আর গুরুমহাশয়ও বলিলেন, “তুমি আমাদের লইয়া গিয়া উহা দেখাইতে পার?” ছেলোট বলিল, “হাঁ, পারি। আমার সঙ্গে আসুন।” তখন ছেলোট এবং গুরুমহাশয় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বালক নিত্যকার অভ্যাসমত ডাকিতে লাগিল, “রাখাল-দাদা, এই আমার গুরুমহাশয় আসিয়াছেন, কোথায় তুমি?” কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। বালক বারংবার ডাকিল, কিন্তু

কোন উত্তর আসিল না। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “রাখাল-দাদা, একবার এস, নতুবা সকলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে।” তখন শুনা গেল বহু দূর হইতে কে যেন বলিতেছে, “আমি তোমার নিকট আসি, কারণ তুমি শুদ্ধস্ব, এবং তোমার সময় হইয়াছে, কিন্তু, তোমার গুরুমহাশয়কে এখনও আমার দর্শন-লাভের জন্য বহু জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।”

‘সহস্র দীপোদ্ভানে’ গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ড যাত্রা করেন, এবং পরবর্তী বসন্তকালের (১৮৯৬ খ্রীঃ) পূর্বে আমি আর তাঁহাকে দেখি নাই। উক্ত সময়ে তিনি দুই সপ্তাহের জন্য ডিট্রয়েটে আগমন করেন। সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতিক লেখক (Stenographer) বিশ্বস্ত গুড্‌উইন্। তাঁহারা রিশিলুতে (The Richelieu) কয়েকখানি ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। রিশিলু একটি ক্ষুদ্র ‘ফ্যামিলি হোটেল’—তথায় একাধিক লোক সপরিবারে বাস করিত। তত্রত্য বহু বৈঠকখানাটি তিনি ক্লাসের অধিবেশন ও বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করিতে পাইতেন। কিন্তু উহা এত বড় ছিল না যে, উহাতে সেই বিপুল জনসংঘের সকলের স্থান সঙ্কুলান হয়, এবং দুঃখের বিষয়, অনেককে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাহর্ষিত করিতে হইত। বৈঠকখানা, দরদালান, সিঁড়ি এবং পুস্তকাগারে সত্য সত্যই এক তিল স্থান থাকিত না। সেই কালে তিনি একেবারে ভক্তিমগ্না ছিলেন—ভগবৎপ্রেমই তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণাস্বরূপ ছিল। তিনি যেন একপ্রকার ঐশ্বরিক উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, প্রেমময়ী জগজ্জননীর সান্নিধ্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছিল।

ডিট্রয়েটে সাধারণের সমক্ষে তাঁহার শেষ উপস্থিতি বেথেল মন্দিরে। স্বামীজির জনৈক অমুরাগী ভক্ত রাবি লুই গ্রোস্ম্যান তথায় যাত্রকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে দিন রবিবার সন্ধ্যাকাল, এবং জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, আমাদের ভয় হইয়াছিল, বুঝি লোকে বিহ্বল হইয়া একটা কি করিয়া বসে। রাস্তার উপরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত ঠাসা লোক, এবং শত শত ব্যক্তিকে ফিরিতে হইয়াছিল। স্বামীজি সেই বৃহৎ শ্রোতৃসংঘকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—“পাশ্চাত্য ভ্রগতের প্রতি ভারতের বাণী” ও “সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ।” তাঁহার বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। সে রজনীতে আচার্যদেবকে যেমনটি দেখিয়াছি, তেমনটি আর কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার সৌন্দর্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা এ পৃথিবীর নহে। মনে হইতেছিল, যেন আত্মাপক্ষী দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে, এবং সেই সময়েই আমি প্রথম তাঁহার আসন্ন দেহাবসানের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহু বর্ষের অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তিনি যে অধিক দিন এ পৃথিবীতে থাকিবেন না, তাহা তখনই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। আমি “না, না, এ কিছু নহে” বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রাণে প্রাণে উহার সত্যতা অনুভব করিলাম। তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ভিতর হইতে বুঝিতেছিলেন, তাঁহাকে কার্য্য করিয়াই যাইতে হইবে।

ইহার পর আমি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার দর্শন

পাই। তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন, এবং দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, এই বিবেচনায় তিনি গোলকোণ্ডা জাহাজে কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তিনি দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন যে, জাহাজখানি 'টিলবেরি ডকে' পৌঁছিবার সময় তাঁহার দুই জন আমেরিকাবাসী শিষ্য তথায় উপস্থিত আছেন। তিনি অমুক দিন যাত্রা করিবেন, একখানি ভারতীয় মাসিক পত্রে এই সংবাদটি পাইবামাত্র আমরা কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সহিত সাফাৎ করিবার জন্ত আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলাম, কারণ, তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমরা অতিশয় ভীত হইয়াছিলাম।

তিনি অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে যেমন বালকের তায় হইয়াছিল, তাঁহার ক্রিয়াকলাপও তদ্রূপ হইয়াছিল। এই সমুদ্রযাত্রার ফলে তিনি তাঁহার পূর্ব বল ও শক্তি কথঞ্চিৎ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। এবার স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। লণ্ডনের অনতিদূরে উইম্বল্ডন্ নামক স্থানের একটি প্রশস্ত পুরাতন ধরণের বাটীতে স্বামিদ্বয়ের জন্ত স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। স্থানটি বেশ কোলাহলশূন্য ও শান্তিপ্রদ ছিল এবং আমরা তথায় একমাসকাল সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম।

স্বামীজি সে বার সাধারণের সমক্ষে কোন বক্তৃতা দি করেন নাই এবং শীঘ্রই স্বামী তুরীয়ানন্দ ও তাঁহার আমেরিকাবাসী বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে আমেরিকা যাত্রা করেন। সমুদ্রবক্ষে দশটি

চিরস্মরণীয় দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা, সংস্কৃত কবিতা ও গল্পের আবৃত্তি ও অনুবাদ এবং সুর করিয়া প্রাচীন বৈদিক স্তোত্রপাঠ হইত। সমুদ্রে বীচি-বিক্ষোভ ছিল না, এবং রজনীতে চন্দ্রালোক অপূর্ব সুখমা বিস্তার করিত। ঐ কয়দিনের সন্ধ্যাগুলি অতি চমৎকার ছিল; আচার্য্য-দেব ডেকের উপর পায়চারী করিতেন, চন্দ্রালোকে তাঁহার বপুঃ অতি মহত্ত্বাবব্যঞ্জক দেখাইত, মধ্যে মধ্যে পাদচারণ হইতে বিরত হইয়া তিনি আমাদের নিকট প্রকৃতির শোভা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতেন এবং বলিয়া উঠিতেন, “দেখ, এই সব মায়া রাজ্যের বস্তুই যদি এত সুন্দর হয়, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, ইহাদের পশ্চাতে যে নিত্যবস্তু রহিয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য কত অপক্লপ !”

এক বিশেষ রমণীয় রজনীতে যখন পূর্ণচন্দ্রের কনককিরণধারায় জগৎ হাসিতেছিল, সেই অপক্লপ মোহকরী রজনীতে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীকভাবে দৃশ্যমাধুরী পান করিতেছিলেন। সহসা আমাদের দিকে চাহিয়া সমুদ্র ও আকাশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “যখন কবিদের চরম সীমা ঐ সম্মুখে রহিয়াছে, তখন আবার কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজন কি ?”

আমরা যথাসময়ে নিউইয়র্ক পৌঁছিলাম; গুরুদেবের সহিত এই দশ দিবস এমন পরমানন্দে ঘনিষ্ঠভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল যে, মনে হইতেছিল, আমরা আরও বিলম্বে পৌঁছিলাম না কেন? ইহার পর তাঁহার সাক্ষাৎ পাই ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে,—এই সময় তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত কিছুদিন যাপন করিবার জন্ত ডিট্রয়েটে আগমন করিয়াছিলেন।

তিনি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন—যেন ভাবময় তনু—যেন সেই মহান্ আত্মা আর হাড়মাসের খাঁচার আবদ্ধ থাকিবে না! আর একবার আমরা সত্যকে দেখিয়াও দেখিলাম না—কোন আশা নাই জানিয়াও তাঁহার আরোগ্যের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলাম।

আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই, কিন্তু “সেই অপর শিষ্যটি” স্বামীজি আমাদের জন্মের মত পরিত্যাগ করিবার পূর্বে, কয়েক সপ্তাহ ভারতে তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ের কথা মনে করিলেই যারপরনাই কষ্ট বোধ হয়। সে হৃদয়ভেদী দুঃখ এখনও আমার সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে কিন্তু এই সকল দুঃখকষ্টের অন্তরালে অতি গভীরপ্রদেশে এক মহতী শান্তি বিরাজমান,—তথায় এই মধুর দিব্য অনুভূতি বর্তমান রহিয়াছে যে, মহাপুরুষগণ স্বীয় জীবন-দ্বারা লোককে সত্যের পন্থা প্রদর্শন করিবার জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হন। আর, এইরূপ একজন মহাপুরুষের সঙ্গ ও রূপালাভ যে আমাদের জীবনে সম্ভবপর হইয়াছিল—তখন আমি এই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করি, এবং দিনের পর দিন তাঁহার উক্তিগুলির মধ্যে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য এবং গভীরতর অর্থ দেখিতে পারি, এবং তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকি, তখন আমার সত্য সত্যই ধারণা হয়—কে যেন বলিতেছে, “জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, উহা পবিত্রভূমি।”

ডিট্রয়েট, মিশিগ্যান, ১৯০৮

এম, সি, ফাঙ্কি

দেববাণী

১৮৯৫ খ্রীঃ, ১৯শে জুন, বুধবার

[স্বামীজি একখানি বাইবেল হস্তে লইয়া ছাত্রগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উহার নবসংহিতাভাগের (New Testament) মধ্যে উপস্থিত জনের গ্রন্থখানি (Gospel according to St. John) খুলিয়া বলিলেন, তোমরা যখন সকলেই খ্রীষ্টিয়ান, তখন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র হইতে আরম্ভ করাই ভাল ।]

জনের গ্রন্থ-প্রারম্ভেই এই-কথাগুলি আছে,—

“আদিতে শব্দমাত্র ছিল, সেই শব্দ ব্রহ্মের সহিত বিত্তমান ছিল, আর সেই শব্দই ব্রহ্ম ।”

হিন্দুরা এই ‘শব্দকে’ মায়া বা ব্রহ্মের ব্যক্তভাব বলে থাকেন, কারণ এটা ব্রহ্মেরই শক্তি । যখন সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাকে আমরা মায়াবরণের মধ্য দিবে দেখি, তখন তাকে আমরা ‘প্রকৃতি’ বলে থাকি । ‘শব্দে’র ছোটো বিকাশ, একটা এই ‘প্রকৃতি’,— এইটেই সাধারণ বিকাশ । আর এর বিশেষ বিকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জৈশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষগণ । সেই নিগুণ ব্রহ্মের বিশেষ বিকাশ যে খ্রীষ্ট, তাঁকে আমরা জেনে থাকি, তিনি আমাদের জ্ঞেয় । কিন্তু নিগুণ ব্রহ্মবস্তুকে আমরা জানতে পারি না । আমরা পরম পিতাকে * জানতে পারি না, কিন্তু তাঁর তনয়কে †

* God the Father.

† God the Son.

জানতে পারি ; নিগূর্ণ ব্রহ্মকে আমরা শুধু মানবরূপ রঙ্গের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি ।

জন-লিখিত গ্রন্থের প্রথম পাঁচ শ্লোকেই খ্রীষ্টধর্মের সারভঙ্গ নিহিত । এর প্রত্যেক শ্লোকটি গভীরতম দার্শনিক তথ্যে পূর্ণ ।

পূর্ণস্বরূপ যিনি, তিনি কখন অপূর্ণ হন না । তিনি অন্ধকারের মধ্যে রয়েছেন বটে, কিন্তু ঐ অন্ধকার তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না । ঈশ্বরের দয়া সকলেরই উপর রয়েছে, কিন্তু তাদের পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না । আমরা নেত্ররোগাক্রান্ত হয়ে সূর্যকে অন্তরূপ দেখতে পারি, কিন্তু তাতে যেমন সূর্য্য তেমনই থাকে, তার কিছু এসে যায় না । জনের উনত্রিশ শ্লোকে যে লেখা আছে, “জগতের পাপ দূর করেন”—তার মানে এই যে, খ্রীষ্ট আমাদের পূর্ণতা লাভ করবার পথ দেখিয়ে দেবেন । ঈশ্বর খ্রীষ্ট হয়ে জন্মালেন—মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়ে দেবার জন্য, আমরাও যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ, এইটে জানিয়ে দেবার জন্য । আমরা হচ্ছি সেই দেবত্বের উপর মনুষ্যত্বের আবরণ দেওয়া, কিন্তু দেবত্বাপন্ন মানুষ হিসাবে খ্রীষ্ট ও আমাদের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নেই ।

ত্রিত্ববাদীদের * (Trinitarian) যে খ্রীষ্ট তিনি আমাদের মত সাধারণ মনুষ্য থেকে অনেক উচ্চে অবস্থিত । একত্ববাদীদের (Unitarian) খ্রীষ্ট ঈশ্বর নন, শুধু একজন

* ত্রিত্ববাদী Trinitarian—ইহাদের মতে ঈশ্বর পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মাভেদে একেই তিন । অপর সম্প্রদায় ইহা অস্বীকার করিয়া বলেন—খ্রীষ্ট মনুষ্যমাত্র ।

মাধুপুত্র। এ দুইয়ের কেউই আমাদের সাহায্য করতে পারেন না। কিন্তু যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরবতার, তিনি নিজ ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হন নি, সেই খ্রীষ্টই আমাদের সাহায্য করতে পারেন, তাঁতে কোনরূপ অপূর্ণতা নেই। এই সকল অবতারদের রাতদিন মনে থাকে যে তাঁরা ঈশ্বর—তাঁরা আজন্ম এটা জানেন। তাঁরা যেন সেই সব অভিনেতাদের মত, যাদের নিজ নিজ অংশের অভিনয় শেষ হয়ে গেছে—নিজেদের আর কোন প্রয়োজন নেই, তবু তাঁরা কেবল অপরকে আনন্দ দেবার জন্তই রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসেন। এই মহাপুরুষগণকে সংসারের কোন মলিনতা স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা কেবল আমাদের শিক্ষা দেবার জন্ত কিছুকাল আমাদের মত মানুষ হয়ে আসেন, আমাদেরই মত বন্ধ বলে ভান করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁরা কখনই বন্ধ নন, সদাই মুক্তস্বভাব।

* * *

মঙ্গল জিনিষটা সত্যের সমীপবর্তী বটে, কিন্তু তবু ওটা সত্য নয়। অমঙ্গল যাতে আমাদের বিচলিত করতে না পারে, এইটে শেখবার পর আমাদের শিখতে হবে, যাতে মঙ্গল আমাদের সুখী করতে না পারে। আমাদের জানতে হবে যে, আমরা মঙ্গল অমঙ্গল দুইয়েরই বাইরে। ওদের উভয়েরই যে স্থাননির্দেশ আছে, সেটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে; আর বুঝতে হবে যে, একটা থাকলেই অপরটা থাকবেই থাকবে। দ্বৈতবাদের ভাবটা প্রাচীন পারসীকদের * কাছ থেকে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে ভাল মন্দ দুই-ই

* জরথুষ্ট্রের অনুগামী প্রাচীন পারস্যবাসীগণ বিশ্বাস করিতেন, অহরমঙ্গল ও অহ্রিমান নামক শুভাশুভের অধিষ্ঠাতা দেবদেয় দ্বারা সমগ্র জগৎ নিয়ন্ত্রিত।

এক জিনিষ এক উভয়ই আমাদের মনে। মন যখন স্থির ও শান্ত হয়, তখন ভাল-মন্দ কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শুভাশুভ দুইয়েরই বন্ধন কাটিয়ে একেবারে মুক্ত হও, তখন এদের কেউ আর তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না, তুমি মুক্ত হয়ে পরমানন্দ সম্ভোগ করবে। অশুভ যেন লোহার শিকল, আর শুভ সোনার শিকল ; কিন্তু দুইই শিকল। মুক্ত হও এবং জন্মের মত জেনে রাখ, কোন শিকলই তোমায় বাঁধতে পারে না। সোনার শিকলটির সাহায্যে লোহার শিকলটি আঁলা করে নাও, তার পর দুটোকে ফেলে দাও। অশুভরূপ কাঁটা আমাদের শরীরে রয়েছে ; ঐ ঝাড়েরই আর একটি কাঁটা (শুভরূপ) নিয়ে পূর্বের কাঁটাটি তুলে ফেলে শেষে দুটোকেই ফেলে দাও, দিয়ে মুক্ত হও।

* * *

জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করো। সর্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও, এতটুকুও যা তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও, কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়ো না। কোন সর্ভ ফর্ভ করো না, তা হলেই তোমার ঘাড়েও কোন সর্ভ ফর্ভ চাপবে না। আমরা যেন আমাদের নিজেদের বদাগ্রতা থেকেই দিয়ে যাই—ঠিক যেমন ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন।

ঈশ্বর একমাত্র দেনেওয়াল, জগতের সকলেই ত দোকানদার মাত্র।..... তাঁর সহ-করা হুণ্ডি (চেক) যোগাড় করলেই যেখানে যাবে তার খাতির হবে।

ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ—তিনি উপলক্ষের বস্তু; কিন্তু তাঁকে কখনও 'ইতি' 'ইতি' করে নির্দেশ করা যায় না।

* * *

আমরা যখন ছুঃখকষ্ট এবং সংঘর্ষের মধ্যে পড়ি তখন জগৎটা আমাদের কাছে একটা অতি ভয়ানক স্থান বলে মনে হয়। কিন্তু যেমন আমরা দুটো কুকুর-বাচ্ছাকে পরস্পর খেলা করতে বা কামড়াকামড়ি করতে দেখে সে দিকে আদৌ খেয়াল দিই না, জানি যে দুটোতে মজা কচ্ছে, এমন কি, মাঝে মাঝে জোরে এক আখটা কামড় লাগলেও জানি যে, তাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে না, তেমনি আমাদেরও মারামারি ইত্যাদি যা কিছু, সব ঈশ্বরের চক্ষে খেলা বই আর কিছু নয়। এই জগৎটা সবই কেবল খেলার জগৎ—ভগবানের এতে শুধু মজাই হয়। জগতে যাই হোক না কেন কিছুতেই তাঁর কোপ উৎপাদন করতে পারে না।

* * *

'পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।

মায়াঝড় মোহতুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।

একে মনমাঝি আনাড়ি,

রিপু ছজন কুজন দাঁড়ী,

কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি ;

ভেসে গেছে ভক্তির হাল,

উড়ে গেল শ্রদ্ধার পাল,

তরী হল বানচাল, উপায় কি করি।

উপায় না দেখে আর,

নীলকমল ভেবেছে সার,

তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার দুর্গানামের ভেলা ধরি।'

মাতঃ, তোমার প্রকাশ যে শুধু সাধুতেই আছে আর পাপীতে

নেই, তা নয় ; এ প্রকাশ প্রেমিকের ভিতরেও যেমন, হত্যাকারীর ভিতরেও তেমনি রয়েছে। মা সকলের মধ্য দিয়েই আপনাকে অভিব্যক্ত করছেন। আলোক অশুচি বস্তুর উপর পড়লেও অশুচি হয় না, আবার শুচি বস্তুর উপর পড়লেও তার গুণ বাড়ে না। আলোক নিত্যশুদ্ধ, সদা অপরিণামী। সকল প্রাণীর পেছনেই সেই সৌম্যাৎ সৌম্যতরা, নিত্যশুদ্ধস্বভাবা, সদা অপরিণামিনী মা রয়েছেন।

“মা দেবী সৰ্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥”

তিনি দুঃখকষ্টে, ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যেও রয়েছেন, আবার সুখের ভিতর, উদাত্ত ভাবের ভিতরও রয়েছেন। ঐ যে ভ্রমর মধুপান করছে ও সেই প্রভুই ভ্রমররূপে মধুপান কচ্ছেন। ঈশ্বরই রয়েছেন জেনে, জ্ঞানী ব্যক্তির নিন্দাস্তুতি দুই-ই ছেড়ে দেন। জেনে রাখ যে, কিছুতেই তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। কি করে করবে? তুমি কি মুক্ত নও? তুমি কি আত্মা নও? তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্রস্বরূপ।*

আমরা সংসারের মধ্য দিয়ে চলেছি, যেন পাহারাওয়ালার আমাদের ধরবার জন্ত পিছু পিছু ছুটছে—তাই আমরা জগতের যা সৌন্দর্য্য, তার শুধু ঈষৎ আভাসমাত্রই দেখে থাকি। এই যে আমাদের এত ভয়, ওটা জড়কে সত্য বলে বিশ্বাস করা থেকে এসেছে। জড়ের যা কিছু সত্তা সে ত কেবল ওর পেছনে মন

* শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রং.....স উ প্রাণশ্চ প্রাণশ্চক্ষুরশ্চক্ষুঃ

—কেনোপনিষৎ, ২য় শ্লোক।

রয়েছে বলে। আমরা জগৎ বলে যা দেখছি, তা ঈশ্বরই—
প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন।

২৩শে জুন, রবিবার

সাহসী ও অকপট হও—তার পর তুমি যে পথে ইচ্ছা ভক্তি-
বিশ্বাসের সহিত চল, অবশ্যই সেই পূর্ণ বস্তুকে লাভ করবে। একবার
শিকলের একটা কড়া কোন মতে যদি ধরে ফেল, সমগ্র শিকল-
টাকে ক্রমে ক্রমে টেনে আন্তে পারবে। গাছের শিকড়ে যদি জল
দাও, সমস্ত গাছটাই তাতে জল পাবে। ভগবানকে যদি আমরা
লাভ করতে পারি, তবে সমুদয়ই পাওয়া গেল।

একষেয়ে ভাবই জগতে মহা অনিষ্টকর জিনিষ। তোমরা
নিজদের ভিতর যত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ করতে পারবে,
ততই জগৎকে বিভিন্নভাবে—কখনও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, কখনও বা
ভক্তের দৃষ্টিতে—সম্ভোগ করতে পারবে। নিজের প্রকৃতিটাকে
আগে ঠিক কর, তার পর সেই প্রকৃতি অনুযায়ী পথ অবলম্বন
করে তাতে লেগে পড়ে থাক। প্রবর্তকের পক্ষে নির্ণাই (একটা
ভাবে দৃঢ় হওয়া) একমাত্র উপায়; কিন্তু যদি যথার্থ ভক্তিবিশ্বাস
থাকে, এবং যদি 'ভাবের ঘরে চুরি' না থাকে, তবে ঐ নির্ণাই
তোমার এক ভাব থেকে সব ভাবে নিয়ে যাবে। গির্জা, মন্দির,
মতমতাস্তর, নানাবিধ অনুষ্ঠান, এগুলি যেন চারাগাছকে রক্ষা
করবার জন্তু তার চারিদিকে বেড়া দেওয়া। কিন্তু যদি গাছটাকে
বাড়াতে চাও, তা হলে শেষে সেগুলিকে ভেঙ্গে দিতে হবে।
এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম, বেদ, বাইবেল, মতমতাস্তর—এ সবও যেন
চারাগাছের টবের মত, কিন্তু টব থেকে ওকে একদিন না একদিন

বেকতে হবে। নিষ্ঠা যেন চারাগাছটিকে টবে বসিয়ে রাখা,—
সাধককে তার নির্বাচিত পথে আগলে রাখা।

সমগ্র সমুদ্রটার দিকে দেখ, এক একটা তরঙ্গের দিকে দেখো
না; একটা পিঁপড়ে ও একজন দেবতার ভিতর কোন প্রভেদ
দেখো না। প্রত্যেক কীটটি পর্যাপ্ত প্রভু ঈশার ভাই। একটাকে
বড়, অপরটাকে ছোট বল কি করে? নিজের নিজের কোটে
সকলেই যে স্ব স্ব প্রধান। আমরা যেমন এখানে রয়েছি, তেমনি
সূর্য্য, চন্দ্র, তারাতেও রয়েছি। আত্মা দেশকালের অতীত ও
সর্বব্যাপী। যে কোন মুখে সেই প্রভুর গুণগান উচ্চারিত হচ্ছে,
তাই আমার মুখ, যে কোন চক্ষু কোন বস্তু দেখছে তাই আমার
চক্ষু। আমরা কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নই; আমরা দেহ নই,
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আমাদের দেহ। আমরা যেন ঐন্দ্রজালিকের মত
মায়াযষ্টি ঘোরাচ্ছি, আর ইচ্ছামত আমাদের সম্মুখে নানা দৃশ্য সৃষ্টি
করছি। আমরা যেন মাকড়সার মত আমাদেরই নির্মিত বৃহৎ
জালের মধ্যে অবস্থান করছি—মাকড়সা যখনই ইচ্ছা করে, তখনই
তার জালের সূতোগুলোর যে-কোনটাতে যেতে পারে। বর্তমানে
সে যেখানটার রয়েছে, সেইখানটাই কেবল জানতে পারছে, কিন্তু
কালে সমস্ত জালটাকে জানতে পারবে। আমরাও এখনও
আমাদের দেহটা যেখানে রয়েছে, সেখানটাতেই নিজ সত্তা অনুভব
করছি, এখন আমরা কেবল একটা মস্তিষ্কমাত্র ব্যবহার করতে
পারি, কিন্তু যখন পূর্ণজ্ঞান বা জ্ঞানাতীত অবস্থায় উপনীত
হই, তখন আমরা সব জানতে পারি, সব মস্তিষ্ক ব্যবহার

করতে পারি। এখনই আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞানকে ধাক্কা দিয়ে এমন ঠেলে দিতে পারি যে, সে তার সীমা ছাড়িয়ে চলে গিয়ে জ্ঞানাভীত বা পূর্ণজ্ঞানভূমিতে কাজ করতে থাকবে।

আমরা চেষ্টা করছি, কেবল অস্তিস্বরূপ, সংস্বরূপ হতে— তাতে 'আমি' পর্য্যন্ত থাকবে না—কেবল শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশ হবে; তাতে সমগ্র জগতের প্রতিবিম্ব পড়বে, কিন্তু তা যেমন তেমনই থাকবে। এই অবস্থা লাভ হলে আর ক্রিয়া কিছু থাকে না, শরীরটা কেবল যন্ত্রবৎ হয়ে যায়; সে সদা শুদ্ধতাবাপন্নই থাকে, তার শুদ্ধির জগু আর চেষ্টা করতে হয় না; সে অপবিত্র হতেই পারে না।

নিজেকে সেই অনন্তস্বরূপ বলে জান, তা হলে ভর একদম চলে যাবে। সর্বদাই বল, "আমি ও আমার পিতা (ঈশ্বর) এক।"*

* * * *

আঙ্গুরগাছে যেমন খোলো খোলো আঙ্গুর ফলে, ভবিষ্যতে তেমনই খোলো খোলো খ্রীষ্টের অভ্যুদয় হবে। তখন সংসারখেলা শেষ হয়ে যাবে। সকলেই সংসারচক্র থেকে বেরিয়ে মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন, একটা কেটলিতে জল চড়ান হয়েছে; জল ফুটতে আরম্ভ হতেই প্রথমে একটার পর একটা করে বুদ্বুদ উঠতে থাকে, ক্রমে এই বুদ্বুদগুলোর সংখ্যা বেশী হতে থাকে, শেষে সমস্ত জলটা টগবগ করে ফুটতে থাকে ও বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। বুদ্বুদ ও খ্রীষ্ট

* I and my father are one,—বাইবেল।

এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দুটি বৃহদ। মুশা ছিলেন একটি ছোট বৃহদ, তার পর তারে বাড়া, তারে বাড়া আরও সব বৃহদ উঠেছে। কোন সময়ে কিন্তু জগৎগুরু এইরূপ বৃহদ হয়ে বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সৃষ্টি ত অবিশ্রাম প্রবাহে চলছেই, আবার নূতন জলের সৃষ্টি হয়ে ঐ পূর্ব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকবে।

২৪শে জুন, সোমবার (অনু স্বামীজি নারদীয় ভক্তিসূত্র হইতে স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন)।

“ভক্তি ঈশ্বরে পরম প্রেমস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপ। যা লাভ করে মানুষ নিক হই, অমৃতত্বলাভ করে ও তৃপ্ত হয়। যা পেলে আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, কোন কিছুর জন্য শোক করে না, কারও প্রতি ঘেব করে না, অপর কোন বিষয়ে আনন্দ অনুভব করে না এবং সাংসারিক কোন বিষয়েই উৎসাহ বোধ করে না। যা জেনে মানব মরু হয়, স্তব্ধ হয় ও আত্মারাম হয়।”*

গুরুমহারাজ বলতেন, “এই জগৎটা একটা মস্ত পাগলা গারদ। এখানে সবাই পাগল—কেউ টাকার জন্য পাগল, কেউ

* ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা

ওঁ অমৃতস্বরূপা চ।

ওঁ যৎ লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি অমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি।

ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিং বাঞ্ছতি ন শোচতি ন ঘেটি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।

ওঁ বজ্জ্ঞানাত্ মস্তো ভবতি গুরো ভবতি আত্মারামো ভবতি।

—নারদভক্তিসূত্র, ১ম অনুবাক, ২য় হইতে ৬ষ্ঠ সূত্র।

মেয়ে মানুষের জ্ঞান পাগল, কেউ নামঘণ্টার জ্ঞান পাগল, আর জনকতক ঈশ্বরের জ্ঞান পাগল। অজ্ঞান জিনিষের জ্ঞান পাগল না হয়ে ঈশ্বরের জ্ঞান পাগল হওয়াই ভাল নয় কি? ঈশ্বর হচ্ছেন পরশমণি। তাঁর স্পর্শে মানুষ এক মুহূর্তে সোনা হয়ে যায়; আকারটা যেমন তেমনি থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতি বদলে যায়—মানুষের আকার থাকে, কিন্তু তার দ্বারা কারও অনিষ্ট করা যেতে পারে না, কিম্বা কোন অজ্ঞায় কর্ম হতে পারে না।”

“ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ গায়, কেউ নাচে, কেউ কেউ অদ্ভুত বিষয় সব বলে। কিন্তু সকলেই সেই এক ঈশ্বরেরই কথা কয়।” *

মহাপুরুষেরা ধর্ম প্রচার করে যান, কিন্তু যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির জ্ঞান অবতারেরা ধর্ম দিতে পারেন। তাঁরা কটাক্ষ বা স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন। খ্রীষ্ট-ধর্মে একেই পবিত্রাত্মার (Holy Ghost) শক্তি বলেছে—এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করেই ‘হস্ত-স্পর্শ’র (The laying-on of hands) কথা বাইবেলে কথিত হয়েছে। আচার্য্য (খ্রীষ্ট) প্রকৃতপক্ষেই শিষ্যগণের ভিতর শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। একেই ‘শুরু-পরম্পরাগত শক্তি’ বলে। এই যথার্থ ব্যাপটিজমই

* ভাগবতে নিম্নলিখিত শ্লোকে এই ভাবের কথা আছে :—

কচিদ্রদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিদ্বসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ

নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুফীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, ৩২শ শ্লোক।

তখন আমরা সকল কৰ্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করতে চাই এবং এক মুহূর্ত তাঁকে বিশ্বস্ত হলে অতিশয় ক্লেশ অনুভব করি।

ঈশ্বর এবং তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি—এ দুয়ের মাঝখানে যেন আর এমন কিছু না আসে, যাতে তোমায় তাঁর দিকে অগ্রসর হতে বাধা দিতে পারে। তাঁকে ভক্তি কর, তাঁর প্রতি অনুরাগী হও, তাঁকে ভালবাস, জগতের লোক যে যা বলে বলুক, গ্রাহ্য করো না। প্রেমভক্তি তিন প্রকার—সমর্থা, সমঞ্জসা, সাধারণী। সাধারণীতে প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রেমাস্পদের নিকট কেবল এই দাও, ঐ দাও বলে চেয়ে থাকে, কিন্তু নিজে কিছু দেয় না; সমঞ্জসায় বিনিময়ের ভাব থাকে—সমর্থায় কিন্তু কিছু প্রতিদান চায় না, যেমন পতঙ্গের আলোর প্রতি ভালবাসা—পুড়ে মরবে তবু ভালবাসতে ছাড়বে না।

“এই ভক্তি—কৰ্ম, জ্ঞান ও যোগ হতেও শ্রেষ্ঠ।”*

কর্মের দ্বারা কর্মকর্তার নিজেরই চিন্তাশক্তি হয়, তার দ্বারা অপরের কোন উপকার হয় না। আমাদের নিজের সাধন করে নিজের উন্নতিসাধন করতে হবে, মহাপুরুষেরা কেবল আমাদের পথ দেখিয়ে দেন মাত্র। “যাদৃশী ভাবনা যশ্চ সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” যীশুর উপর যদি তুমি তোমার ভার দাও, তা হলে তোমায় সদা সর্বদা তাঁকে চিন্তা করতে হবে, এই চিন্তার ফলে তুমি তদ্বাবাপন্ন হবে। এইরূপ সদা সর্বদা ভাবনার নামই ভক্তি বা প্রেম। “পরা ভক্তি ও পরা বিদ্যা এক জিনিষ।”

* ওঁ সা তু কৰ্মজানযোগেভ্যোহপ্যধিকতরা।

—নারদভক্তিসূত্র, ৪র্থ অনুবাক, ২৫শ সূত্র।

তবে ঈশ্বর সঙ্কে কেবল নানা মতমতান্তরের আলোচনা করলে চলবে না। তাঁকে ভালবাসতে হবে ও সাধন করতে হবে। সংসার ও সাংসারিক বিষয় সব ত্যাগ কর, বিশেষতঃ যতদিন “চারাগাছটা” —মন শক্ত না হয়। দিবারাত্রি ঈশ্বরচিন্তা কর এক যতদূর সম্ভব অন্য বিষয়ের চিন্তা ছেড়ে দাও। দৈনন্দিন যে সকল কর্তব্য ও চিন্তা না করলে নয়, সেগুলি সবই তদ্ব্যবহিত হয়ে করা যেতে পারে।

‘শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় কর যাকে ধ্যান,

আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্রামা মারে।’

সকল কার্যো, সকল বস্তুতে তাঁকে দর্শন কর। অপরের সঙ্গে ঈশ্বর কথার আলাপ কর। এতে আমাদের সাধনপথে খুব সাহায্য হয়ে থাকে।

ভগবানের অথবা তাঁর যোগ্যতম সন্তান যে সূব মহাপুরুষ তাঁদের রূপালাভ কর।* এই দুটাই হচ্ছে ভগবানলাভের প্রধান উপায়।

এই সকল মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হওয়া বড়ই কঠিন, পাঁচ মিনিট কাল তাঁদের সঙ্গলাভ করলে একটা সারা জীবন বদলে যায়। † আর যদি সত্যসত্যই প্রাণে প্রাণে এই মহাপুরুষসঙ্গ চাও, তবে তোমার কোন না কোন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হবেই হবে।

এই ভক্তেরা যেখানে থাকেন, সেই স্থান তীর্থস্বরূপ হয়ে যায়,

* ওঁ মুখ্যতস্ত মহৎকুপৈব ভগবৎকুপালেশায়া।

—নারদভক্তিসূত্র, ৫ম অধ্যায়, ৩৮ সূত্র।

† মহৎদঙ্গস্ত দুর্লভোহগম্যোহমোষচ।

—ঐ, ৫ম অধ্যায়, ৩৯শ সূত্র।

তারা যা বলেন, তাই শাস্ত্রস্বরূপ, তারা যে কোন কার্য করেন, তাই সংকর্ষ, এমনি তাঁদের যাহাছা।* তাঁরা যে স্থানে বাস করেছেন, সেই স্থান তাঁদের দেহনিঃসৃত পবিত্র শক্তিস্পন্দনে পূর্ণ হয়ে যায়; যারা সেথায় যায়, তারাই এই স্পন্দন অনুভব করে; তাইতে তাদেরও ভিতরে পবিত্রভাবে সঞ্চার হতে থাকে।

“এইরূপ ভক্তগণের ভিতর জাতি, বিষ্ণা, রূপ, কুল, ধন প্রভৃতির ভেদ নাই। যে হেতু তারা তাঁর।”†

অসৎসঙ্গ একেবারে ছেড়ে দাও, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায়। বিষয়ী লোকদের সঙ্গ ত্যাগ কর, তাতে চিন্তাচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে থাকে। ‘আমি’ ‘আমার’ এই ভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। যার জগতে ‘আমার’ বলতে কিছুই নেই, তাঁরই কাছে ভগবান আবির্ভূত হন। সব রকম মায়িক প্রীতির বন্ধন কেটে ফেল। আলস্য ত্যাগ কর, আর, ‘আমার কি হবে’, এরূপ ভাবনা একেবারে ভেবো না। তুমি যে সব কাজ করেছ, তার ফলাফল দেখবার জন্ত ফিরেও চেয়ো না। ভগবানে সমর্পণ করে কর্ষ করে যাও, কিন্তু ফলাফলের চিন্তা একেবারে করো না।‡ যখন সব মনঃপ্রাণ

* ওঁ তীর্থা কুর্কস্তু তীর্থানি, স্কর্ষা কুর্কস্তু কর্ষাণি, সচ্ছাত্রী কুর্কস্তু শাস্ত্রাণি।

ওঁ তন্নয়ঃ।—নারদভক্তিসূত্র, ২ম অনুবাক, ৩২ ও ৩৩ সূত্র।

† ওঁ নাস্তি তেষু জাতিবিষ্ণারূপকুলধনক্রিয়াভেদঃ।

ওঁ যতস্তুরীয়াঃ।

—ঐ, ২ম অনুবাক, ৭২ ও ৭৩ সূত্র।

‡ ওঁ দুঃসঙ্গঃ সর্কথৈব ত্যাগ্যঃ।

ওঁ কামক্রোধমোহমুত্তিভ্রংশবুদ্ধিনাশ (সর্কনাশ) কারণত্বং।

এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভগবানের দিকে যায়, যখন টাকাকড়ি বা নামযশ খুঁজে বেড়াবার সময় থাকে না, ভগবান্ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করবার অবসর থাকে না, তখনই হৃদয়ে সেই অপার অপূর্ব প্রেমানন্দের উদয় হবে। বাসনাগুলো ত শুধু কাঠের মালার মত অসার জিনিষ।

প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি অহেতুকী, “এতে কোন কামনা নেই, এটি নিত্য নূতন ও প্রতিক্রমে বাড়তে থাকে”, এটি স্বল্প অনুভব-স্বরূপ। অনুভবের দ্বারাই একে বুঝতে হয়, ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না।*

“ভক্তিই সব চেয়ে সহজ সাধন। ভক্তি স্বাভাবিক, এতে কোন যুক্তিতর্কের অপেক্ষা নেই; ভক্তি স্বয়ংপ্রমাণ, এতে আর অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা নেই”। † যুক্তি তর্ক কাকে বলে?—

ওঁ তদঙ্গারিতা অগীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি।

ওঁ কস্তুরতি কস্তুরতি মায়াং ? যঃ সঙ্গং ত্যজতি,

যো মহানুভাবঃ সেবতে, নিশ্চয়মো ভবতি।

ওঁ যো বিবিক্তস্থানং সেবতে, যো লোকবন্ধমুন্ময় যজতি,

নিশ্চৈশ্চুণ্যো ভবতি, যোগক্ষেমং ত্যজতি।

ওঁ যঃ কন্দ্রফলং ত্যজতি, কন্দ্রাণি সন্ন্যস্ততি, ততো নিষ্কন্দো ভবতি।

ওঁ বেদানপি সন্ন্যস্ততি; কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে।

—নারদভক্তিসূত্র, ৬ষ্ঠ অনুবাক, ৪৩ হইতে ৪৯ সূত্র।

• ওঁ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্রমবর্জমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমশুদ্ধবরূপম্।

—ঐ, ৭ম অনুবাক, ৫৪ সূত্র।

† ওঁ অকৃত্যং সৌমভ্যং ভক্তৌ।

ওঁ প্রমাণান্তরস্থানপেক্ষাতঃ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ।

—ঐ, ৮ম অনুবাক, ৫৮ ও ৫৯ সূত্র।

কোন বিষয়কে আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা। আমরা যেন (মনরূপ) জাল ফেলে কোন বস্তুকে ধরে বলি, এই বিষয়টা প্রমাণ করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কখনও জাল দিয়ে ধরতে পারব না,—কোন কালেও নয়।

ভক্তি অহৈতুকী হওয়া চাই। এমন কি, আমরা যখন প্রেমের অযোগ্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসি, তখনও সেই প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত আনন্দের খেলা। প্রেমকে যেকোনো বাবহার করি না কেন, “প্রেম কিন্তু স্বভাবতঃই শান্তি ও আনন্দস্বরূপ”।*

হত্যাকারী যখন নিজ শিশুকে চুষন করে, তখন সে ভালবাসা ছাড়া আর সব ভুলে যায়। অহংটাকে একেবারে নাশ করে ফেল। কাম ক্রোধ ত্যাগ কর—ঈশ্বরকে সর্বস্ব সমর্পণ কর। ‘নাহং নাহং—তুঁহু তুঁহু’—পুরাতন মানুষটা একেবারে চলে গেছে, কেবল একমাত্র তুমিই আছ। ‘আমি—তুমি’। কাউকে নিন্দে করো না। যদি দুঃখ বিপদ আসে, জেনো, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে খেলা করছেন—আর এইটি জেনে দুঃখের ভিতরও পরম সুখী হও।

ভক্তি বা প্রেম দেশকালের অতীত, উহা পূর্ণস্বরূপ।

২৫শে জুন, মঙ্গলবার

যখনই কোন সুখভোগ করবে, তার পরে দুঃখ আসবেই আসবে—এই দুঃখ তখন তখনই আসতে পারে, অথবা খুব বিলম্বেও আসতে পারে। যে আত্মা যত উন্নত, তার সুখের পর

* ওঁ শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ।

—নারায়ণভক্তিসূত্র, ৮ম অনুবাক, ৬০ সূত্র।

দুঃখ তত শীঘ্র আসবে। আমরা চাই—সুখ দুঃখ উভয়ের অতীত অবস্থায় যেতে। এ উভয়ই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়। উভয়ই শিকল—একটা লোহার শিকল, অপরটা সোনার শিকল। এ উভয়ের পশ্চাতেই আত্মা রয়েছে—তাঁতে সুখও নেই, দুঃখও নেই। সুখ দুঃখ উভয়ই অবস্থা বিশেষ, আর অবস্থামাত্রেরই সদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু আত্মা আনন্দস্বরূপ, অপরিণামী, শান্তিস্বরূপ। আমাদের আত্মাকে যে লাভ করতে হবে, তা নয়; আমরা আত্মাকে পেয়েই আছি, কেবল তাঁর উপর যে ময়লা পড়েছে, সেইটে ধুয়ে ফেলে তাঁকে দর্শন কর।

এই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই আমরা জগৎকে ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারব। খুব উচ্চতাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত কর, আমি যে সেই অনন্ত আত্মস্বরূপ, এই জেনে আমাদের জগৎ-প্রপঞ্চের দিকে সম্পূর্ণ শান্তভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এই জগৎটা একটি ছোট শিশুর খেলার মত; আমরা যখন তা জানি, তখন জগতে যাই হোক না কেন, কিছুতেই আমাদের চঞ্চল করতে পারবে না। যদি প্রশংসা পোলে মন উৎকুল হয়, তবে নিন্দায় নিশ্চিত বিষণ্ণ হবে। ইন্দ্রিয়ের, এমন কি, মনেরও সমুদয় সুখ অনিত্য; কিন্তু আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, যে সুখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। ঐ সুখ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত সুখ, ঐ সুখ আনন্দস্বরূপ। সুখের জন্ত বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না করে যত ভিতরের উপর নির্ভর করব—যতই আমরা 'অন্তঃসুখ, অন্তরারাম ও অন্তর্জ্যোতিঃ' হব—আমরা ততই ধার্মিক হব। এই আত্মানন্দকেই জগতে ধর্ম বলে থাকে।

অন্তর্জগৎ—যা বাস্তবিক সত্য, তা বহির্জগৎ অপেক্ষা অনন্তগুণে বড়। বহির্জগৎটা—সেই সত্য অন্তর্জগতের ছায়াময় বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই জগৎটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়; এটা সত্যের ছায়া-স্বরূপমাত্র। কবি বলেছেন, কল্পনা—“সত্যের সোনালী ছায়া।”

আমাদের বাদ দিলে জগৎটা অচেতন মৃত জড়পদার্থ মাত্র। আমরা যখন জগতের মধ্যে প্রবেশ করি, তখনই তা আমাদের পক্ষে সজীব হয়ে ওঠে। আমরাই জগতের পদার্থসমূহকে জীবন দান করছি, কিন্তু আবার আহাম্মকের মত ঐ কথা ভুলে গিয়ে কখনও তা থেকে ভয় পাচ্ছি, কখনও আবার তাই ভোগ করতে যাচ্ছি। আঁস্চুর্ভি কাছে না থাকলে ঘুম হবে না—যেমন সেই মেছুনীদের হয়েছিল—এমন যেন তোমাদের না হয়। কতকগুলো মেছুনী আঁস্চুর্ভি মাথায় করে বাজার থেকে বাড়ী ফিরছিল—এমন সময় খুব ঝড়বৃষ্টি এল। তারা বাড়ী যেতে না পেরে পথে তাদের এক আলাপী মালিনীর বাগানবাড়ীতে আশ্রয় নিলে। মালিনী রাতে তাদের যে ঘরে শুতে দিলে, তার ঠিক পাশেই ফুলের বাগান। হাওয়াতে বাগানের সুন্দর সুন্দর ফুলের গন্ধ তাদের নাকে আসতে লাগল—সেই গন্ধ তাদের এত অসহ্য বোধ হতে লাগল যে, তারা কোন মতে ঘুমতে পারে না। শেষে তাদের মধ্যে একজন বললে, ‘দেখ, আমাদের আঁস্চুর্ভিগুলোতে জল ছড়িয়ে দিয়ে মাথার কাছে রেখে দেওয়া যাক।’ তাই করাতে যখন নাকের কাছে সেই আঁস্চুর্ভির গন্ধ আসতে লাগল তখন তারা আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমতে লাগল।

এই সংসারটা আঁস্চুর্ভির মত—আমরা যেন সুখভোগের জন্ত

ওর উপর নির্ভর না করি। ধারা করে, তারা তামসপ্রকৃতি বা বহুজীব। তার পর আবার রাজসপ্রকৃতির লোক আছে; তাদের অহংটা খুব প্রবল, তারা সদাই “আমি আমি” বলে থাকে। তারা কখন কখন সংকার্যা করে থাকে, চেষ্টা করলে তারা ধার্মিক হতে পারে। কিন্তু সাত্বিকপ্রকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ—তারা সদাই অন্তর্মুখ—তারা সদাই আত্মনিষ্ঠ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এই সব, রজঃ ও তমোগুণ আছে; এক এক সময় মানুষে এক এক গুণের প্রাধান্য হয় মাত্র।

সৃষ্টি মানে একটা কিছু নির্মাণ বা তৈরী করা নয়, সৃষ্টি মানে—যে সাম্যভাব নষ্ট হয়ে গেছে, সেইটাকে পুনর্লাভ করবার চেষ্টা—যেমন একটা শোলার ছিপি (কর্ক) যদি টুকরো টুকরো করে জলের নীচে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে সেগুলো যেমন আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে কতকগুলো মিলে জলের উপরে ভেসে ওঠবার চেষ্টা করে, সেই রকম। যেখানে জীবন, যেখানে জগৎ সেখানে কিছু না কিছু মন্দ, কিছু না কিছু অশুভ থাকবেই থাকবে। একটুখানি অশুভ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। জগতে যে কিছু কিছু মন্দ রয়েছে, এ খুব ভাল; কারণ, সাম্যভাব এলে এই জগৎই নষ্ট হয়ে যাবে। সাম্য ও বিনাশ যে এক কথা। যতদিন এই জগৎ চলে, ততদিন সঙ্গে সঙ্গে ভালমন্দও চলে; কিন্তু যখন আমরা জগৎকে অতিক্রম করি, তখন ভালমন্দ দুয়েরই পারে চলে যাই,—পরমানন্দ লাভ করি।

জগতে দুঃখবিরহিত সুখ, অশুভবিরহিত শুভ কখন পাবার সম্ভাবনা নেই; কারণ, জীবনের অর্থই হচ্ছে সাম্যভাবের বিচ্যুতি।

আমাদের চাই মুক্তি ; জীবন, সুখ বা শুভ—এ সবের কোনটাই নয়। সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্তকাল ধরে চলেছে—তার আদিও নেই, অন্তও নেই—যেন একটা অগাধ হ্রদের উপরকার সদা-গতিশীল তরঙ্গ। ঐ হ্রদের এমন সব গভীর স্থান আছে, যেখানে আমরা এখনও পৌঁছতে পারিনি, এবং আর কতকগুলি জায়গা আছে, যেখানে সাম্যভাব পুনঃ সংস্থাপিত হয়েছে—কিন্তু উপরের তরঙ্গ সর্বদাই চলেছে, তথায় অনন্তকাল ধরে ঐ সাম্যাবস্থা লাভের চেষ্টা চলেছে। জীবন ও মৃত্যু একটা ব্যাপারেরই বিভিন্ন নামমাত্র, একই মূদ্রার এপিঠ ওপিঠ। উভয়ই মায়ী—এ অবস্থাটাকে পরিষ্কার করে বোঝবার জো নেই—এক সময়ে বাঁচবার চেষ্টা হচ্ছে, আবার পরমুহুর্তে বিনাশ বা মৃত্যুর চেষ্টা। আমাদের যথার্থ স্বরূপ—আত্মা—এই উভয়েরই পারে। আমরা যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তা আর কিছু নয়, তা প্রকৃতপক্ষে সেই আত্মাই—যা থেকে আমরা আমাদের পৃথক করে ফেলেছি, আর আমাদের থেকে পৃথক বলে উপাসনা করছি। কিন্তু তা চিরকালই একমাত্র ঈশ্বরপদবাচ্য যে আমাদের অন্তরাত্মা, তাঁরই উপাসনা।

সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হতে হলে আমাদের প্রথমে রজঃ দ্বারা তমঃ, পরে সত্ত্ব দ্বারা রজঃকে জয় করতে হবে। সত্ত্ব অর্থে সেই স্থির, ধীর, প্রশান্ত অবস্থা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে শেষে অগ্ৰাণ্য ভাব অর্থাৎ রজঃ তমঃ একেবারে চলে যাবে। বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দাঁও, মুক্ত হও, যথার্থ 'ঈশ্বরতনয়' হও, তবেই ধীশুর মত পিতাকে দেখতে পাবে। ধর্ম ও ঈশ্বর বলতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য্য বুঝায়। দুর্বলতা, দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি

মুক্তস্বভাব হও, তবেই তুমি কেবলমাত্র আত্মা ; যদি মুক্তস্বভাব হও, তবেই অমৃতত্ব তোমার করতলগত ; তবেই বলি, ঈশ্বর ষষ্ঠার্থ আছেন—যদি তিনি মুক্তস্বভাব হন ।

জগৎটা আমার জন্ত, আমি কখন জগতের জন্ত নই । ভালমন্দ আমাদের দাসস্বরূপ, আমরা কখনও তাদের দাস নই । পশুর স্বভাব হচ্ছে—যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় পড়ে থাকা ; মানুষের স্বভাব মন্দ ত্যাগ করে ভালটা পাবার চেষ্টা করা ; আর দেবতার স্বভাব—ভালমন্দ কিছুর জন্ত চেষ্টা থাকবে না—সর্বদা, সর্বাবস্থায় আনন্দময় হয়ে থাকা । আমাদের দেবতা হতে হবে । হৃদয়টাকে সমুদ্রের মত মহান্ করে ফেল ; জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব সকলের পারে চলে যাও ; এমন কি অশুভ এলেও আনন্দে উন্নত হয়ে যাও ; জগৎটাকে একটা ছবির মত দেখ ; এইটি জেনে রাখ যে, জগতে কোন কিছুই তোমায় বিচলিত করতে পারে না ; আর এইটি জেনে জগতের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ কর । জগতের সুখ কি রকম জান ? যেন ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করতে করতে কাদার মধ্য থেকে কাচের মালা কুড়িয়ে পেয়েছে । জগতের সুখতৃষ্ণের উপর শান্তভাবে দৃষ্টিপাত কর, ভালমন্দ উভয়কেই এক বলে দেখ—উভয়ই ভগবানের খেলা, সুতরাং ভালমন্দ, সুখতৃষ্ণ—সবেতেই আনন্দ কর ।

শুরু মহারাজ বলতেন, “সবই নারায়ণ বটে, কিন্তু বাঘ নারায়ণের কাছ থেকে সরে থাকতে হয় । সব জলই নারায়ণ বটে, তবে ময়লা জল খাওয়া যায় না ।”

“গগনময় খালে রবিচন্দ্র দীপক জলে”—অল্প মন্দিরের আর কি দরকার ? “সব চক্ষু তোমার চক্ষু, অথচ তোমার চক্ষু নাই ; সব হস্ত তোমার হস্ত, অথচ তোমার হস্ত নাই ।” *

কিছু পাবারও চেষ্টা করো না, কিছু ছাড়বারও চেষ্টা করে না—হেরোপাদেরবর্জিত হও, বদৃচ্ছালাভসম্বষ্ট হও । কোন কিছুতে যখন তোমায় বিচলিত করতে পারবে না, তখনই তুমি মুক্তি বা স্বাধীনতাপদবী লাভ করেছ, বুঝতে হবে । কেবল সহ করে গেলে হবে না—একেবারে অনাসক্ত হও । সেই ষাঁড়ের গল্পটি মনে রেখো । একটা মশা অনেকক্ষণ ধরে একটা ষাঁড়ের শিঙ্গে বসেছিল—অনেকক্ষণ বসবার পর তার ঔচিত্যবুদ্ধি জেগে উঠল ; হয়ত ষাঁড়ের শিঙ্গে বসে থাকার দরুন তার বড় কষ্ট হচ্ছে—এই মনে করে সে ষাঁড়কে সম্বোধন করে বলতে লাগল, ‘ভাই ষাঁড়, আমি অনেকক্ষণ তোমার শিঙ্গের উপর বসে আছি, বোধ হয় তোমার অসুবিধে হচ্ছে, আমার মাপ করো, এই আমি উড়ে যাচ্ছি ।’ ষাঁড় বললে, ‘না, না, তুমি সপরিবারে এসে আমার শিঙ্গে বাস কর না—আমার তাতে কি এসে যায় ?’

২৬শে জুন, বুধবার

যখন আমাদের অহংজ্ঞান থাকে না, তখনই আমরা সব চেয়ে ভাল কাজ করতে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করতে পারি । বড় বড় প্রতিভাশালী লোকেরা সকলেই একথা জানেন । ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ কর্তা—তার কাছে হৃদয়

* অগ্নিপাদো জ্বনো গ্রহীতা ।

পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ । যেতাযতরোপনিবৎ ৩১২

দেববাণী

খুলে দাও, নিজে নিজে কিছু করতে বেগ না। ~~ঈশ্বর~~ ~~পিতার~~
বলছেন, 'ন মে পার্থস্বি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।'
'হে অর্জুন, ত্রিলোকে আমার কর্তব্য বলে কিছুই নেই'। তাঁর
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত হও, তা হলেই
তোমার দ্বারা কিছু কাজ হবে। যে সকল শক্তিতে কাজ হয়,
তাদের ত আর আমরা দেখতে পাই না, আমরা কেবল তাদের
ফলটা দেখতে পাই মাত্র। অহংকে সরিয়ে দাও, নাশ করে ফেল,
ভুলে যাও; তোমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করুন—এ ত তাঁরই
কাজ, তিনি বুঝুন। আমাদের আর কিছু করতে হবে না—কেবল
সরে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে কাজ করতে দেওয়া। আমরা যত সরে
যাব, ততই ঈশ্বর আমাদের ভিতর আসবেন। 'কাঁচা আমি'টাকে
নষ্ট করে ফেল—কেবল 'পাকা আমি'টাই থেকে থাকুক।

আমরা এখন যা হয়েছি, তা আমাদের চিন্তাগুলোরই
ফলস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কি চিন্তা কর, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য
রেখো। বাক্য ত গৌণ জিনিষ। চিন্তাগুলোই বহুকালস্থায়ী,
আর তাদের গতিও বহুদূরব্যাপী। আমরা যে কোন চিন্তা করি,
তাতে আমাদের চরিত্রের ছাপ লেগে যায়; এই হেতু সাধুপুরুষদের
ঠাট্টায় বা গালে পর্য্যন্ত তাঁদের হৃদয়ের ভালবাসা ও পবিত্রতার
একটুখানি রয়ে যায় এবং তাতে আমাদের কল্যাণ সাধনই করে।

কিছুমাত্র কামনা করো না। ঈশ্বরের চিন্তা কর, কিন্তু কোন
কলকামনা করো না। যারা কামনাশূন্য, তাঁদেরই কাজ ফলপ্রসূ।
ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীরা লোকের দ্বারে দ্বারে ধর্ম বহন করে নিয়ে
যান কিন্তু তাঁরা মনে করেন, আমরা কিছুই করছি না। তাঁরা

কোনরূপ দাবিদাওয়া করেন না, তাঁদের কাজ তাঁদের অজ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। যদি তাঁরা (ঐহিক) জ্ঞানরূপ বৃক্ষের ফল * খান তা হলে ত তাঁদের অহঙ্কার এসে যাবে, আর যা কিছু লোককল্যাণ তাঁরা করবেন—সব লোপ হয়ে যাবে। যখনই আমরা ‘আমি’ এই কথা বলি, তখনই আমরা আহাশুক বনি, আর বলে যাই—আমরা ‘জ্ঞান’ লাভ করেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ‘চোকটাকা বলদের মত’ ঘানিতেই ক্রমাগত ঘুরছি। ভগবান্ অতি উত্তমরূপে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই তাঁর কাজও সর্বোত্তম। এইরূপ যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পারেন, তিনি সবচেয়ে ধেনী কাজ করতে পারেন। নিজেকে জয় কর, তা হলেই সমুদয় জগৎ তোমার পদতলে আসবে।

সব্বশুণে অবস্থিত হলে আমরা সকল বস্তুর আসল স্বরূপ দেখতে পাই, তখন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির অতীত প্রদেশে চলে যাই। অতঃই সেই বহুদূত প্রাচীর, যা আমাদেরকে বন্ধ করে রেখেছে—সত্যের মুক্ত বাতাসে যেতে দিচ্ছে না—সকল বিষয়েই, সকল কাজেই তাইতে ‘আমি আমার’ এই ভাব মনে এনে দেয়—আমরা ভাবি, আমি অমুক কাজ করেছি, তমুক কাজ করেছি, ইত্যাদি। এই ক্ষুদ্র আমিভাবটাকে দূর করে দাও, আমাদের মধ্যে এই যে অহংরূপ পৈশাচিক ভাব রয়েছে, তাকে একেবারে মেরে

* বাইবেলে বর্ণিত আছে. প্রথমতঃই মানবমানবী আদম ও ইভকে ঈশ্বর নন্দনকাননে স্থাপন করে তথাকার জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে মানা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সয়তানের প্ররোচনায় তাই খেয়ে পূর্বের নিম্পাপ স্বভাব থেকে জড় হন। এখানে জ্ঞান অর্থে সুখসুখ, ভালমন্দ প্রভৃতি আপেক্ষিক জ্ঞান।

ফেল। 'নাহং নাহং, তুঁছ তুঁছ' এই মন্ত্র উচ্চারণ কর, প্রাণে প্রাণে এটা অনুভব কর, জীবনে ঐ ভাবটাকে নিয়ে এস। যতদিন না এই অহংভাব গঠিত জগৎটাকে ত্যাগ করতে পারছি, ততদিন আমরা কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারব না। কেউ কখনও পারে নি, আর পারবেও না। সংসার ত্যাগ করা মানে—এই অহংটাকে একেবারে ভুলে যাওয়া, অহংটার দিকে একেবারে খেয়াল না রাখা; দেহে বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যেন আমরা দেহের না হয়ে যাই। এই বজ্জাং আমিটাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলতে হবে। লোকে যখন তোমায় মন্দ বলবে, তুমি তাদের আশীর্বাদ করো; ভেবে দেখো তারা তোমার কত উপকার করছে; অনিষ্ট যদি কারও হয়, ত কেবল তাদের নিজেদের হচ্ছে। এমন জায়গায় যাও, যেখানে লোকে তোমাকে ঘৃণা করে; তারা তোমার অহংটাকে মেরে মেরে তোমার ভিতর থেকে বার করে দিক—তুমি তা হলে ভগবানের খুব কাছে এগুবে। বানরী যেমন তার বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে থাকে কিন্তু পরিশেষে বাধ্য হলে তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, তাকে পদদলিত করতেও পশ্চাৎপদ হয় না, সেইরূপ আমরাও সংসারটাকে যতদিন পারি আঁকড়ে ধরে থাকি, কিন্তু অবশেষে যখন তাকে পদদলিত করতে বাধ্য হই, তখনই আমরা ঈশ্বরের কাছে যাবার অধিকারী হই। ধর্মের জন্ত যদি অপরের অত্যাচার সহ্য করতে হয় ত আমরা ধন্ত; যদি আমরা লিখতে পড়তে না জানি ত আমরা ধন্ত; আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে তফাৎ করবার জিনিষ অনেক কমে গেল।

ভোগ হচ্ছে লক্ষণা সাপ—তাকে আমাদের পদদলিত করতে

হবে। আমরা ভোগ ত্যাগ করে অগ্রসর হতে লাগলাম ; কিছুই না পেয়ে হ্রত আমাদের নৈরাশ্য এল। কিন্তু লেগে থাক, লেগে থাক—কখনই ছেড়ে না। এই সংসারটা একটা পিশাচের মত। এ সংসার যেন একটা রাজ্য—আমাদের ক্ষুদ্র অহং যেন তার রাজা। তাকে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াও। কামকাঙ্ক্ষন, নামযশ ত্যাগ করে দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরকে ধরে থাক, অবশেষে আমরা সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীনতা লাভ করব। ইন্দ্রিয়চরিতার্থই সুখ, এ ধারণা সম্পূর্ণ জড়বাদাম্বক। ওতে এক কণাও বার্থ সুখ নেই ; যা কিছু সুখ, তা সেই প্রকৃত আনন্দের প্রতিবিম্বমাত্র।

যারা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা তথাকথিত কর্মীদের চেয়ে জগতের জন্ত অনেক বেশী কাজ করেন। আপনাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করেছে, এমন একজন লোক হাজার ধর্মপ্রচারকের চেয়ে বেশী কাজ করে। চিন্তাশুদ্ধি ও মৌন থেকেই কথার ভিতর জোর আসে।

পদ্মের মত হও। পদ্ম এক জামগায়ই থাকে, কিন্তু যখন ফুটে ওঠে, তখন চারদিক থেকে মৌমাছি আপনি এসে জোটে। *

শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের ভিতর পাপ বা অশুভ দেখতে পেতেন না—তিনি জগতে কিছু মন্দ দেখতে পেতেন না, কাজেই

* অর্থাৎ নিজে সাধন-ভজন করিয়া চরিত্রের উন্নতিসাধন কর। তোমাদের জ্ঞানভক্তির ফলকে আকৃষ্ট হইয়া লোকে আপনি আনিয়া তোমাদের নিকট শিক্ষা করিবে, তোমাদের কোথাও ছুটাছুটি করিয়া প্রচার করিতে বাইতে হইবে না।

সেই মন দূর করবার জন্ত চেষ্টা করারও কোন প্রয়োজন দেখতেন না। আর কেশবচন্দ্র একজন মস্ত ধর্মসংস্কারক, নেতা, এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ সাধনাস্তে এই শাস্ত্রপ্রকৃতি দক্ষিণেশ্বরবাসী মহাপুরুষ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র জগতের ভাবরাজ্যে এক মহা ওলটপালট এনে দিয়ে গেছেন। এই সকল নীরব মহাপুরুষ বাস্তবিক মহাশক্তির আধার—তঁারা প্রেমে তন্ময় হয়ে জীবনযাপন করে ভবরঙ্গমঞ্চ হতে সরে যান। তঁারা কখন 'আমি আমার' বলেন না। তঁারা আপনাদিগকে ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করেই ধন্ত মনে করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণই খ্রীষ্ট ও বুদ্ধসকলের জন্মদাতা। তঁারা সদাই ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণভাবে তাদাত্ম্য লাভ করে এই বাস্তবজগৎ থেকে বহুদূরে এক আদর্শজগতে বাস করেন। তঁারা কিছুই চান না এবং জ্ঞাতমারে কিছু করেনও না। তঁরাই প্রকৃতপক্ষে জগতের সর্বপ্রকার উচ্চতাবের প্রেরকস্বরূপ—তঁারা জীবনযুক্ত, একেবারে অহংশুণ্ড। তঁাদের ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান একেবারে উড়ে গেছে, নামঘশের আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নেই। তঁাদের ব্যক্তিত্ব সব লোপ হয়ে গেছে, তঁারা নিরাকার তত্ত্বস্বরূপ।

২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার

(স্বামীজি অগ্নি বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্ট লইয়া আসিলেন এবং পুনর্বার জনের গ্রন্থ পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।)

যীশুখ্রীষ্ট যে শাস্তিদাতা পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, মহম্মদ

আপনাকে সেই শাস্তিদাতা বলে দাবি করতেন।* তাঁর মতে যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিকভাবে জন্ম হয়েছিল—একথা স্বীকার করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। সকল যুগে, সকল দেশেই এইরূপ দাবি দেখতে পাওয়া যায়। সকল বড়লোকেই—দেবতা হতে তাঁদের জন্ম হয়েছে—এই দাবি করে গেছেন।

জ্ঞান জিনিষটা আপেক্ষিক মাত্র। আমরা ঈশ্বর হতে পারি, কিন্তু তাঁকে কখন জানতে পারি না। জ্ঞান একটা নিম্নতর অবস্থা মাত্র। তোমাদের বাইবেলেও আছে, আদম যখন 'জ্ঞানলাভ করলেন,' তখনই তাঁর পতন হল। তার পূর্বে তিনি স্বয়ং সত্যস্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ, ঈশ্বরস্বরূপ ছিলেন। আমাদের মুখ আমাদের থেকে কিছু পৃথক পদার্থ নয়, কিন্তু আমরা কখন আসল মুখটাকে দেখতে পাই না, আমাদের তার প্রতিবিম্বমাত্র দেখতে হয়। আমরা নিজেরাই প্রেমস্বরূপ, কিন্তু যখন ঐ প্রেমসঙ্গকে চিন্তা করতে যাই, তখনই দেখি, আমাদের একটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় তাহাতেই প্রমাণ হয় যে আমরা যাকে জড় বলি, সেটা চিং-এর বহিরভিব্যক্তিমাত্র।

নিরুত্তি অর্থে সংসার থেকে সরে আসা। হিন্দুদের পুরাণে আছে, প্রথম সৃষ্ট চারিজন ঋষিকেঃ হংসরূপী ভগবান্ শিক্ষা

* যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইব বটে; কিন্তু আমি তোমাদের কল্যাণের জন্ত শাস্তিদাতাকে (Comforter) পাঠাইয়া দিব। খ্রীষ্টানেরা বলেন, এই Comforter, Holy Ghost--বা পবিত্রাত্মারূপী ঈশ্বর।

‡ সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার

দিয়েছিলেন যে, সৃষ্টিপ্রপঞ্চ গৌণমাত্র; স্মৃতরাং তাঁরা আর প্রজ্ঞা সৃষ্টি করলেন না। এর তাৎপর্য এই যে, অভিব্যক্তির অর্থই অবনতি; কারণ, আত্মাকে অভিব্যক্ত করতে গেলে শব্দ দ্বারা ঐ অভিব্যক্তি সাধিত হয়, আর 'শব্দ ভাবকে নষ্ট করে ফেলে'।* তা হলেও, তত্ত্ব জড়াবরণে আবৃত না হয়ে থাকতে পারে না, যদিও আমরা জানি যে অবশেষে এইরূপ আবরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে আমরা আসলটাকেই হারিয়ে ফেলি। সকল বড় বড় আচার্য্যাই একথা বুঝেন, আর সেইজন্যই অবতারেরা পুনঃ পুনঃ এসে আমাদের মূল তত্ত্বটি বুঝিয়ে দিয়ে যান আর সেইকালের উপযোগী তার একটি নূতন আকার দিয়ে যান। গুরুমহারাজ বলতেন, ধর্ম এক। সকল অবতারেরাই এই কথাই শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তবে সকলকেই সেই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে কোন না কোন আকার দিতে হয়। সেইজন্য তাঁরা তাকে তার পুরাতন আকারটি হতে উঠিয়ে নিয়ে একটি নূতন আকারে আমাদের সামনে ধরেন। যখন আমরা নামরূপ থেকে বিশেষতঃ দেহ থেকে মুক্ত হই, যখন আমাদের ভালমন্দ কোন দেহের প্রয়োজন থাকে না, তখনই কেবল আমরা বন্ধন অতিক্রম করতে পারি। অনন্ত উন্নতি মানে অনন্তকালের জ্ঞান বন্ধন; তার চেয়ে সকল রকম আকৃতির ধ্বংসই বাঞ্ছনীয়। আমাদের সর্বরকম দেহ, এমন কি দেবদেহ থেকেও মুক্তিলাভ করতে হবে। ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ সত্যবস্তু, দুটি সত্যবস্তু কখনও থাকতে পারে না। একমাত্র আত্মাই আছেন, এবং আমিই সেই।

* "The letter killeth"—বাইবেল, ২য় করিন্থিয়ান, ৩য় অঃ, ৬ষ্ঠ শ্লোক

কেবল মুক্তিলাভের সহায়ক বলেই শুভকর্মের যা মূল্য। তার দ্বারা কর্তারই কল্যাণ হয়, অপর কারও কিছু হয় না।

* * * * *

জ্ঞান মানে শ্রেণীবদ্ধ করা—কতকগুলি জিনিষকে এক শ্রেণীর ভিতর ফেলা। আমরা এক প্রকারের অনেকগুলি জিনিষকে দেখলাম—দেখে সেই সবগুলিকে কোন একটা নাম দিলাম, তাতেই আমাদের মন শান্ত হল। আমরা কেবল কতকগুলি ‘ঘটনা’ বা ‘ব্যাপার’ আবিষ্কার করে থাকি, কিন্তু ‘কেন’ সেগুলি ঘটছে, তা জানতে পারি না। আমরা অজ্ঞানেরই আরও খানিকটা বেশী জায়গা ব্যেপে এক পাক ঘুরে এসে মনে করি, আমরা কিছু জ্ঞানলাভ করলাম। এই জগতে ‘কেন’র কোন উত্তর পাওয়া যেতে পারে না; ‘কেন’র উত্তর পেতে হলে আমাদেরই ভগবানের কাছে যেতে হবে। যিনি সকলের জ্ঞাতা, তাঁকে কখন প্রকাশ করা যায় না। এ যেন হুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে যাওয়া—যেমন নামূল, অমনি গলে সমুদ্রে মিশে গেল।

বৈষম্যই সৃষ্টির মূল—একরসতা বা সাম্যই ঈশ্বর। এই বৈষম্যভাবের পারে চলে যাও; তা হলেই জীবন ও মৃত্যু উভয়কেই জয় করবে, এবং অনন্ত সময়ে পৌঁছাবে—তখনই তোমরা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হবে, স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হবে। মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা কর, তাতে প্রাণ যায়, সেও স্বীকার। একখানা বইয়ের সঙ্গে তার পাতাগুলোর যে সম্বন্ধ, আমাদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানগুলোরও সেই সম্বন্ধ; আমরা কিন্তু অপরিণামী,

সাক্ষররূপ, আত্মরূপ; আর তাঁরই উপর জন্মান্তরের ছায়া পড়ছে; যেমন একটা মশাল খুব জ্বরে জ্বরে ঘোরাতে থাকলে চোকে একটা বৃত্তাকার প্রতীতি হয়। আত্মাতেই সমস্ত ব্যক্তিত্বের একত্ব; আর যেহেতু আত্মা অনন্ত, অপরিণামী ও অচঞ্চল, সেই হেতু আত্মা ব্রহ্মরূপ। আত্মাকে জীবন বলতে পারা যায় না, কিন্তু তাই থেকে সমুদয় জীবন গঠিত হয়। একে সুখ বলা যায় না, কিন্তু এই থেকেই সুখের উৎপত্তি হয়।

* * * *

আজকাল জগতের লোকে ভগবানকে পরিত্যাগ করছে, কারণ, লোকের ধারণা—জগতের যতদূর সুখস্বচ্ছন্দতা বিধান করা উচিত, তা তিনি করছেন না; এই হেতু লোকে বলে থাকে, “তাঁকে নিয়ে আমাদের লাভ কি?” আমাদের কি ঈশ্বরকে কেবল একজন মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা বলে ভাবতে হবে নাকি?

আমরা এইটুকু করতে পারি যে, আমাদের সব বাসনা ঈর্ষা, ঘৃণা, ভেদবুদ্ধি—এইগুলিকে দূর করে দিতে পারি। ‘কাঁচা আমি’কে নষ্ট করে ফেলতে হবে, মনকে মেরে ফেলতে হবে—একরকম মানসিক আত্মহত্যা আর কি। শরীর ও মনকে পবিত্র ও সুস্থ রাখ—কিন্তু কেবল ঈশ্বরলাভ করবার যন্ত্ররূপে; ঐটুকুই এদের একমাত্র যথার্থ প্রয়োজন। কেবল সত্যের জগতই সত্যের অনুসন্ধান কর, তার দ্বারা আনন্দলাভ হবে, একথা ভেবো না। আনন্দ আপনা হতে আসতে পারে, কিন্তু তাই যেন তোমার সত্যলাভ করবার প্ররোচক না হয়।

ঈশ্বর লাভ কাতীত অণ্ড কোন অভিসন্ধি রেখো না। সত্যলাভ করতে হলে যদি নরকের ভিতর দিয়েও যেতে হয়, তাতেও পেছপা হয়ো না।

২৮শে জুন, শুক্রবার

(অণ্ড সকলেই স্বামীজির সহিত এক স্থানে বনভোজনে যাত্রা করিয়াছিলেন। যদিও স্বামীজি যেখানেই থাকিতেন, তথায়ই তাঁহার উপদেশ দানের বিরাম ছিল না, কিন্তু অণ্ডকার উপদেশের কোন প্রকার 'নোট' রাখা হয় নাই। তবে বাহির হইবার পূর্বে প্রাতরাশের সময় তিনি এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন।)

সর্বপ্রকার অন্নের জগৎ ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও—অন্নই ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁর সন্দর্বাণিনী শক্তিই আমাদের ব্যক্তিশক্তিতে পরিণত হয়ে আমাদের সর্বপ্রকার কার্য করতে সাহায্য করে থাকে।

২৯শে জুন, শনিবার

(অণ্ড স্বামীজি গীতা হস্তে লইয়া উপস্থিত হইলেন।)

গীতার হৃদীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়বৃত্ত জীবাগ্নাগণের ঈশ্বর গুড়াকেশ অর্থাৎ নিদ্রার অধীশ্বর বা নিদ্রাজয়ী অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন। এই জগৎই 'ধর্মক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্র। পঞ্চপাণ্ডব (অর্থাৎ ধর্ম) শত কোঁরবের (আমরা যে সকল বিষয়ে আসক্ত এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সতত বিরোধ তাদের) সহিত যুদ্ধ করছেন! পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন (অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জীবাগ্না) সেনাপতি। আমাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়স্থলের সঙ্গে—যুদ্ধ করতে হবে, তাদের মেরে ফেলতে হবে।

আমাদের নিঃসঙ্গ হরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমরা ব্রহ্মরূপ,
আমাদের আর সমস্ত ভাবকে এই ভাবে ডুবিয়ে দিতে হবে।

ক্রীকৃষ্ণ সব কাজই করেছিলেন, কিন্তু সর্কপ্রকার আসক্তিবর্জিত
হয়ে। তিনি সংসারে ছিলেন বটে, কিন্তু কখন সংসারী হয়ে
যান নি। সকল কাজ কর, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে কর; কাজের জন্তই
কাজ কর, নিজের জন্ত কখনও করো না।

* * * *

নামরূপাত্মক কোন কিছু কখন মুক্তস্বভাব হতে পারে না।
মুক্তিকা থেকে যেমন নামরূপের দ্বারা ঘটাদি হয়, সেইরূপ
সেই মুক্তস্বভাব ব্রহ্ম থেকে নামরূপের দ্বারা আমরা হয়েছি।
তখন সেই মুক্তস্বভাব ব্রহ্ম সসীম বা বদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়েন;
সুতরাং আপেক্ষিক সত্তাকে কখন মুক্তস্বভাব বলা যেতে পারে
না। ঘট যতক্ষণ ঘট থাকে, ততক্ষণ আপনাকে কখনই মুক্ত
বলতে পারে না, যখনই সে নামরূপ ভুলে যান, তখনই মুক্ত
হয়। সমুদ্র জগৎটাই আত্মস্বরূপ—বহুভাবে অভিব্যক্ত, যেন
এক সুরের মধ্যেই নানা রঙ পরঙ তোলা হয়েছে—তা না
হলে একঘেয়ে হয়ে পড়ত। সময়ে সময়ে বেসুর বাজে বটে,
তাতে বরং পরবর্তী সুরের ঐক্যটা আরও মিষ্ট লাগে।
মহান্ বিশ্বসঙ্গীতে তিনটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়,—
সাম্য, বল ও স্বাধীনতা।

যদি তোমার স্বাধীনতার অপরের কিছু ক্ষতি হয়, তা হলে
বুঝতে হবে, সে স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। অপরের
কোন প্রকার ক্ষতি কখন করো না।

মিষ্টান বলেছেন, “হৃদয়তাই হুঃখ।” কর্ম ও ফলভাগ—এই দুটির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। (অনেক সময়েই দেখা যায়, যে, হাসে বেশী, তাকে কাঁদতে হয়ও বেশী—যত হাসি তত কাঁদা) “কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন”—কস্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে।

* * * *

জড়ভাবে দেখলে কুচিন্তাগুলিকে রোগবীজাণু বলা যেতে পারে। আমাদের দেহ যেন লৌহপিণ্ডের মত, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন তার উপর আস্তে আস্তে হাতুড়ির ষা মারা—তাই দিয়ে আমরা দেহটাকে যে ভাবে ইচ্ছা, গঠন করি।

আমরা জগতের সমুদয় সৃষ্টিস্বারাশির উত্তরাধিকারিস্বরূপ, কিন্তু সেগুলিকে আমাদের মধ্যে অবাধে আসতে দেওয়া চাই।

শাস্ত্র ত সব আমাদের মধ্যেই রয়েছে। “মূর্খ, শুন্তে পাচ্ছ না কি, তোমার নিজ হৃদয়ে দিবারাত্র সেই অনন্ত সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে—“সচ্চিদানন্দঃ সচ্চিদানন্দঃ, সোহহং সোহহং।”

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর—কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের দেবতা—সকলেরই ভিতর অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ রয়েছে। প্রকৃত ধর্ম একমাত্র, আমরা তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে, তার বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে, তার বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে ঝগড়া করে মরি। আমরা খুঁজতে জানে তাদের কাছে সত্যযুগ ত বর্তমানই রয়েছে। আমরা নিজেরাই নষ্ট হয়েছি, আর জগৎকে নষ্ট মনে করছি।

এ জগতে পূর্ণশক্তির কোন কার্য থাকে না। তাকে কেবল ‘অস্তি’ বা ‘সং’ মাত্র বলা যায়, তার কোন কার্য থাকে না।

যথার্থ সিদ্ধিলাভ এক বটে, তবে আপেক্ষিক সিদ্ধি নানাবিধ হতে পারে।

৩০শে জুন, রবিবার

একটা কিছু কল্পনা আশ্রয় না করে চিন্তা করবার চেষ্টা আর অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা—এক কথা। আমরা কোন একটি বিশেষ স্তম্ভপায়ী জীবকে অবলম্বন না করে স্তম্ভপায়ী জীবমাত্রের কোন ধারণা করতে পারি না। ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধেও ঐ কথা।

জগতে যত প্রকার ভাব বা ধারণা আছে, তার যে স্বল্প সার নিষ্কর্ষ, তাকেই আমরা ঈশ্বর বলি।

প্রত্যেক চিন্তার দুটি ভাগ আছে—একটি হচ্ছে ভাব, আর দ্বিতীয়টা ঐ ভাবগোতক ‘শব্দ’—আমাদের ঐ দুটিকেই নিতে হবে। কি বিজ্ঞানবাদী (Idealist), কি জড়বাদী (Materialist), কারও মত খাঁটি সত্য নয়। আমাদের ভাব ও তার প্রকাশ দুই-ই নিতে হবে।

আমরা আর্সিতেই আমাদের মুখ দেখতে পাই—সমুদয় জ্ঞানও সেইরকম যা বাইরে প্রতিবিম্বিত হয় তারই জ্ঞান। কেউ কখন তার নিজের আত্মা বা ঈশ্বরকে জানতে পারবে না, কিন্তু আমরা স্বয়ংই সেই আত্মা, আমরাই ঈশ্বর।

তোমার তখনই নির্কারণ অবস্থা লাভ হবে, যখন তোমার ‘তুমিত্ব’ একেবারে উড়ে যাবে। বুদ্ধ বলেছিলেন—“যখন ‘তুমি’ থাকবে না, (অর্থাৎ যখন কাঁচা আমিটা চলে যাবে) তখনই তোমার যথার্থ অবস্থা --তখনই তোমার সর্বোচ্চ অবস্থা।”

অধিকাংশ ব্যক্তিতে সেই আভ্যন্তরীণ ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ

আবৃত ও অংশট হইয়া রয়েছে। যেন একটা লোহার পিপের তিতর একটা আলো রাখা হয়েছে, ঐ আলোর এতটুকু জ্যোতিঃও বাইরে আসতে পারছে না। একটু একটু করে পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা অভ্যাস করতে করতে আমরা ঐ মাঝখানকার আড়ালটাকে খুব পাতলা করে ফেলতে পারি। অবশেষে সেটা কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ঐ লোহার পিপে কাচে পরিণত হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে সেই আভ্যন্তরীণ জ্যোতিঃ ঠিক ঠিক দেখা যাচ্ছে। আমরা সকলেই এক সময়ে না এক সময়ে এইরূপ কাচের পিপে হব—এমন কি, এর চেয়েও উচ্চ উচ্চ বিকাশের আধারভূত হব। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আদৌ কোন পিপে রয়েছে, ততদিন আমাদের জড় উপায়ের সাহায্যেই চিন্তা করতে হবে। অসহিষ্ণু ব্যক্তি কোন কালে সিদ্ধ হতে পারে না।



বড় বড় সাধুপুরুষেরা আদর্শ তত্ত্বের (Principle) দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ; কিন্তু শিষ্যেরা ব্যক্তিকেই আদর্শ বা তত্ত্ব করে তোলে, আর ব্যক্তিকে নাড়াচাড়া করতে করতে তত্ত্বটা ভুলে যায়।

বুদ্ধের সগুণ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তর্ক করার ফলে ভারতে প্রতিমাপূজার সূত্রপাত হল ! বৈদিক যুগে প্রতিমার অস্তিত্ব ছিল না, তখন লোকে সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন করত। কিন্তু বুদ্ধের প্রচারের ফলে আমরা জগৎশ্রষ্টা ও আমাদের সখাস্বরূপ ঈশ্বরকে হারালাম, আর তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রতিমাপূজার উৎপত্তি হল। লোকে বুদ্ধের মূর্তি গড়ে পূজা করতে আরম্ভ করলে। যীশুখ্রীষ্ট সঙ্ঘর্ষেও তাই হয়েছে। কাঠ পাথরে পূজা থেকে যীশু বুদ্ধের পূজা পর্যন্ত

সমুদয়ই প্রতিমা-পূজা, কিন্তু কোন না কোনরূপ মূর্তি ব্যতীত আমাদের চলতে পারে না।

* * * * *

স্বাক্ষর করে সংস্কারের চেষ্টার ফল এই যে তাতে সংস্কার বা উন্নতির গতি রোধ হয়। কাউকে বলো না—‘তুমি মন্দ’। বরং তাকে বল—‘তুমি ভালই আছ, আরও ভাল হও।’

পুরুতরা সব দেশেই অনিষ্ট করে থাকে; কারণ তারা লোককে গাল দেয় ও তাদের কুসমালোচনা করে। তারা একটা দড়ি ধরে টান দেয়, মনে করে সেটাকে ঠিক করবে, কিন্তু তার ফলে আর ৫ তিনটা দড়ি স্থানভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। প্রেমে কখন গাল মন্দ করে না, শুধু প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই ঐ রকম করে থাকে। ন্যায়সঙ্গত রাগ বা বৈধ হিংসা বলে কোন জিনিষ নেই।

যদি তুমি কাউকে সিংহ হতে না দাও, তা হলে সে খুঁত শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে। স্ত্রীজাতি শক্তিশ্বরূপিনী, কিন্তু এখন ঐ শক্তি কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে, তার কারণ, পুরুষে তার উপর অত্যাচার করছে। এখন সে শৃগালীর মত; কিন্তু যখন তার উপর আর অত্যাচার হবে না, তখন সে সিংহী হয়ে দাঁড়াবে।

সাধারণতঃ ধর্মভাবকে বিচার বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা উচিত। তা না হলে ঐ ভাবের অবনতি হয়ে ওটা ভাবুকতামাত্রে পরিণত হতে পারে।

* * * * *

আস্তিকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, এই পরিণামী জগতের পশ্চাতে একটা অপরিণামী বস্তু আছে,—যদিও সেই চরম পদার্থের

ধারণা সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। বুদ্ধ এটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলতেন, “ব্রহ্ম বা আত্মা বলে কিছু নেই।”

চরিত্র হিসাবে জগতের মধ্যে বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড়; তার পর খ্রীষ্ট। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন, তার মত মহান উপদেশ জগতে আর নেই। যিনি সেই অদ্ভুত কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি সেই সকল বিরল মহাত্মাদের মধ্যে একজন, যাদের জীবন দ্বারা সমগ্র জগতে এক এক নবজীবনের শ্রোত বয়ে যায়। যিনি গীতা লিখেছেন, তাঁর মত আশ্চর্য্য মাথা মনুষ্যজাতি আর কখনও দেখতে পাবে না!

* * * * *

জগতে একটা মাত্র শক্তিই রয়েছে—সেইটেই কখনও মন্দ, কখনও বা ভাল ভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে। ঈশ্বর আর সমতান একই নদী—কেবল স্রোতটা পরস্পরের বিপরীত-দিকগামী।

১লা জুলাই, সোমবার

(শ্রীরামকৃষ্ণদেব)

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা একজন খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন— এমন কি, তিনি সকল প্রকার ব্রাহ্মণের দানও গ্রহণ করতেন না। তাঁর জীবিকার জন্তু সাধারণের মত কোন কাজ করবার জো ছিল না। তাঁর বই বিক্রী করবার বা কারু চাকরী করবার জো ত ছিলই না, এমন কি, তাঁর কোন দেবমন্দিরে পৌরোহিত্য করবারও উপায় ছিল না। তিনি একরূপ আকাশবৃষ্টি অবলম্বী ছিলেন, যা অযাচিত ভাবে উপস্থিত হত, তাতেই

বে, 'তিনি তাদেরই লোক। তিনি সকলকেই ভালবাসতেন। তাঁর দৃষ্টিতে সকল ধর্মই সত্য—তিনি বলতেন, ধর্মজগতে সব ধর্মেরই স্থান আছে। তিনি মুক্তস্বভাব ছিলেন, কিন্তু সকলের প্রতি সমান প্রেমেই তাঁর মুক্তস্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেত, বজ্রবৎ কঠোরতায় নয়। এইরূপ কোমল থাকের লোকেরাই নূতন ভাবের সৃষ্টি করেন, আর 'ইক-ডেকে' থাকের লোকে ঐ ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। সেন্টপল এই শেষ থাকের ছিলেন। তাই তিনি সত্যের আলোক চতুর্দিকে বিস্তার করেছিলেন।

সেন্টপলের যুগ কিন্তু এখন আর নেই। আমাদেরই অধুনাতন জগতের নূতন আলোকস্বরূপ হতে হবে। আমাদের যুগের এখন বিশেষ প্রয়োজন—এমন একটি সজ্ব, যা আপনা হতেই নিজেকে দেশকালোপযোগী করে নেবে। যখন তা হবে, তখন সেইটেই জগতের শেষ ধর্ম হবে। সংসারচক্র চলবেই—আমাদের তাকে সাহায্য করতে হবে, তাকে বাধা দিলে চলবে না। নানাবিধ ধর্মভাবরূপ তরঙ্গ উঠছে পড়ছে আর সেই সকল তরঙ্গের শীর্ষদেশে সেই যুগের অবতার বিরাজ করছেন। রামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্মশিক্ষা দিতে এসেছিলেন—তাঁর ধর্মে কিছু ভাঙ্গাচোরা নেই, তাঁর ধর্ম হচ্ছে গড়া। তাঁকে নূতন করে প্রকৃতির কাছে গিয়ে সত্য জ্ঞানবার চেষ্টা করতে হয়েছিল, ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক ধর্ম লাভ করেছিলেন। সে ধর্ম কাউকে কিছু মেনে নিতে বলে না, নিজে পরখ করে নিতে বলে। "আমি সত্য দর্শন

করছি, তুমিও ইচ্ছা করলে দেখতে পার।”—আমি যে সাধন অবলম্বন করেছি, তুমিও সেই সাধন কর, তা হলে তুমিও আমার মত সত্য দর্শন করবে। ঈশ্বর সকলের কাছেই আসবেন—সেই সমত্বভাবে সকলেরই আয়ত্তের ভিতর রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যা উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি হিন্দুধর্মের সারস্বরূপ, তাঁর নিজের সৃষ্ট কোন নূতন বস্তু নয়। আর তিনি সেগুলি তাঁর নিজস্ব বলে কখন দাবীও করেন নি; তিনি নামঘণ্টের জন্ত কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করতেন না। তাঁর বয়স যখন প্রায় চল্লিশ, সেই সময় তিনি প্রচার করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি ঐ প্রচারের জন্ত কখন বাইরে কোথাও যান নি। যারা তাঁর কাছে এসে উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের জন্ত তিনি অপেক্ষা করেছিলেন।

হিন্দুলমাজের প্রধানুযায়ী তাঁর পিতামাতা তাঁর যৌবনের প্রারম্ভে পাঁচ বছরের একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। বালিকা এক সুদূর পল্লীতে তাঁর নিজ পরিজনের মধ্যে বাস করতে লাগলেন—তাঁর যুবা পতি যে কি কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার বিষয় তিনি কিছু জানতেন না। যখন তিনি বয়স্ক হইলেন, তখন তাঁর স্বামী ভগবৎপ্রেমে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন। তিনি হেঁটে দেশ থেকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর স্বামীকে দেখেই, তাঁর যে কি অবস্থা তা বুঝতে পারলেন; কারণ, তিনি স্বয়ং মহা বিগত ও উন্নত স্বভাবা ছিলেন। তিনি তাঁর কার্যে কেবল সাহায্য করবারই ইচ্ছা করেছিলেন;

তাঁর কখনও এ ইচ্ছা হয় নি যে, তাঁকে গৃহস্থপদবীতে টেনে নামিয়ে আনেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে মহান্ অবতারপুরুষগণের মধ্যে একজন বলে পূজিত হয়ে থাকেন। তাঁর জন্মদিন তথায় ধর্মোৎসবরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

* * * *

একটি বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত গোলাকার শিলা বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপী ভগবানের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাতঃকালে পুরোহিত এসে সেই শালগ্রামশিলাকে পুষ্পচন্দন নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করেন, ধূপকপূরাদির দ্বারা আরতি করেন, তার পর তাঁর শয়ন দিয়ে ঐরূপ ভাবে পূজার জন্তু তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর স্বরূপতঃ রূপবিবর্জিত হলেও, তিনি ঐরূপ প্রতীক বা কোনরূপ জড় বস্তুর সাহায্য ব্যতীত তাঁর উপাসনা করতে পাচ্ছেন না, এই দোষ বা দুর্বলতার জন্তু তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি শিলাটিকে স্নান করান, কাপড় পরান এবং নিজের চৈতন্যশক্তি দ্বারা তাঁর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন।

* * * *

একটি সম্প্রদায় আছে, তারা বলে—ভগবানকে কেবল শিব ও সুন্দররূপে পূজা করা দুর্বলতামাত্র, আমাদের অশিবরূপকেও ভালবাসতে হবে, পূজা করতে হবে। এই সম্প্রদায় তিব্বত দেশের সর্বত্র বিদ্যমান আর তাদের ভিতর বিবাহ-পদ্ধতি নেই। ভারতে এই সম্প্রদায়ের প্রকাশ্যভাবে থাকবার জো নেই, সুতরাং তারা গোপনে গোপনে সম্প্রদায় করে থাকে। কোন ভদ্রলোক

শুপ্তভাবে ভিন্ন এই সকল সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারেন না। তিব্বত দেশে তিনবার সমাধিকারবাদ* কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই সে চেষ্টা বিফল হয়। তারা খুব তপস্বী করে থাকে, আর শক্তি (বিভূতি) লাভ হিসাবে তাতে খুব সফলতা লাভও করে থাকে।

‘তপস্’ শব্দের ধাত্বর্থ তাপ দেওয়া বা উত্তপ্ত করা। এটা আমাদের উচ্চ প্রকৃতিকে ‘তপ্ত’ বা উত্তেজিত করবার সাধনা বা প্রক্রিয়াবিশেষ। যেমন, হস্ত উদয়ান্ত জপ করা—সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ক্রমাগত ওঙ্কারজপ। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা এমন একটা শক্তি জন্মায়, যাকে আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক যে কোন রূপে ইচ্ছা, পরিণত করা যেতে পারে। এই তপস্বার ভাব সমগ্র হিন্দুধর্মে ওতপ্রোত রয়েছে। এমন কি হিন্দুরা বলেন যে, ঈশ্বরকেও জগৎ সৃষ্টি করবার জন্য তপস্বী করতে হয়েছিল। এটা যেন মানসিক যন্ত্রবিশেষ—এ দিয়ে সব করা যেতে পারে। শাস্ত্রে আছে—“ত্রিভুবনে এমন কিছু নেই, যা তপস্বী দ্বারা পাওয়া না যেতে পারে।”

* * * * *

যে সব লোক এমন সব সম্প্রদায়ের মতামত বা কার্যকলাপের বর্ণনা করে, যাদের সঙ্গে তাদের সহানুভূতি নেই, তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যাবাদী। যারা সম্প্রদায়বিশেষে দৃঢ়বিশ্বাসী

* Communism—কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে উচিত নয়, সকলের সাধারণ সম্পত্তি থাকিবে, এই মত।

তারা অপর সম্প্রদায়ে যে সত্য আছে, তা বড় একটা দেখতে পায় না।

* * * *

ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আজ মাসের কোন্ তারিখ? তিনি তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘রামই আমার সন তারিখ সব। আমি আর কোনও সন তারিখ জানি না।’

২ রা জুলাই, মঙ্গলবার

(জগজ্জননী)

শাক্তেরা জগতের সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা বলে পূজা করে থাকেন—কারণ, মা নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু নেই। ভারতে মাতাই স্ত্রীচরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাকে হিন্দুরা দক্ষিণাচার বা দক্ষিণমার্গ বলেন, ঐ উপাসনার আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, মুক্তি হয়,—এর দ্বারা কখন ঐহিক উন্নতি হয় না। আর তাঁর ভীষণ রূপের—রুদ্রমূর্তির উপাসনাকে বামাচার বা বামমার্গ বলে; সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব হয়ে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না। কালে ঐ থেকে অবনতি এসে থাকে, আর যারা তার সাধন করে, সেই জাতির একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশরূপ, আর জনকের ধারণা

থেকে জননীর ধারণা ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হয়ে থাকে। মা নাম করলেই শক্তির ভাব, সর্বশক্তিমত্তা, ঐশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে। শিশু যেমন আপনার মাকে সর্বশক্তিমতী মনে করে থাকে—মা সব করতে পারে! সে জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যস্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী—তাকে উপাসনা না করে আমরা কখন নিজেদের জানতে পারি না।

সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তার সমষ্টিস্বরূপিণী। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই সেই জগদম্মা। তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনি প্রেমরূপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি একজন ব্যক্তি—তাকে জানা যেতে পারে এবং দেখা যেতে পারে (যেমন রামকৃষ্ণ তাঁকে জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন)। সেই জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। তিনি অতি সত্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন।

তিনি যখন ইচ্ছা যে কোনরূপে আমাদের কাছে দেখা দিতে পারেন। সেই জগজ্জননীর নাম রূপ দুই থাকতে পারে। অথবা রূপ না থেকে শুধু নাম থাকতে পারে। তাঁকে এই সকল বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করতে করতে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে নামরূপ কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধসত্তামাত্র বিরাজিত।

যেমন. কোন শরীরবিশেষের সমুদয় কোষগুলি (Cells)

দেববাণী

মিলে একটি মানুষ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবাণু মনে এক একটি কোষ স্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর—আর সেই সমস্ত সত্ত্ব (ব্রহ্ম) তারও অতীত। সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে বলা যায় ব্রহ্ম, আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই আমরা শক্তি বা মা বলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকাল-নিমিত্তস্বরূপ। সেই ব্রহ্মই মা। তাঁর দুই রূপ—একটি সবিশেষ বা সগুণ, এবং অপরটি নিকির্শেষ বা নিগুণ। প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ, দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিকৃপাধিক সত্ত্ব থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিভাব এসেছে। সমস্ত সত্ত্ব—বা কিছু আমরা জানতে পারি, সবই এই ত্রিকোণাত্মক; এইটাই বিশিষ্টাদ্ভৈত ভাব।

সেই জগদম্বার এক কণা, এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খ্রীষ্ট। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে তারই উপাসনাতে মহত্ব লাভ হয়। যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।

৩রা জুলাই, বুধবার

মোটামুটি বলতে গেলে বলা যায়, ভয়েতেই মানুষের ধর্মের আরম্ভ। “ঈশ্বরভীতিই জ্ঞানের আরম্ভ।” কিন্তু পরে তা থেকে এই উচ্চতর ভাব আসে যে, “পূর্ণ প্রেমের উদয়ে ভয় দূরে যায়।” যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা জ্ঞানলাভ করছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা ঈশ্বর কি বস্তু জানতে পারছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু না কিছু ভয় থাকবেই। যীশুখ্রীষ্ট মানুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি

জগতে অপবিত্রতা দেখতে পেতেন—আর তার খুব নিন্দাও করে গেছেন। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তরূপে শ্রেষ্ঠ, তিনি জগতে কিছু অশ্রাব্য দেখতে পান না, সুতরাং তাঁর ক্রোধেরও কোন কারণ নেই। অশ্রাব্যের প্রতিবাদ বা নিন্দাবাদ কখনও সর্বোচ্চ ভাব হতে পারে না। ডেভিডের হস্ত শোণিতে কলুষিত ছিল, সেই জন্তু তিনি মন্দির নির্মাণ করতে পারেন নি।

আমাদের হৃদয়ে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতার ভাব যতই বাড়তে থাকে, ততই আমরা বাইরে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতা দেখতে পাই। আমরা অপরের কার্যের যে নিন্দাবাদ করি, তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা। তুমি তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটাকে ঠিক কর, যা তোমার হাতের ভিতর রয়েছে—তা হলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও তোমার পক্ষে আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে। এ যেন জলস্থিতিবিজ্ঞানের (Hydrostatics) সমস্তার মত—এক বিন্দু জলের শক্তিতে সমগ্র জগৎকে সাম্যাবস্থায় রাখা যেতে পারে। আমাদের ভিতরে যা নেই, বাইরেও তা দেখতে পারি না। বৃহৎ ইঞ্জিনের পক্ষে তৎসদৃশ অতি ক্ষুদ্র ইঞ্জিন যেরূপ, সমগ্র জগতের তুলনায় আমরাও তদ্রূপ। ক্ষুদ্র ইঞ্জিনটির ভিতর কোন গোলমাল দেখে, আমরা বৃহৎ ইঞ্জিনটাতেও কোন গোল হয়েছে, এরূপ কল্পনা করে থাকি।

জগতে যথার্থ যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তা প্রেমের শক্তিতেই হয়েছে। দোষ দেখিয়ে দেখিয়ে কোন কালে ভাল কাজ করা যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। নিন্দাবাদে কোনই ফল হয় না।

যথার্থ বৈদান্তিককে সকলের সহিত মহানুভূতি করতে হবে। কারণ, অদ্বৈতবাদ বা সম্পূর্ণ একত্বতাবই বেদান্তের সার মর্ম। দ্বৈতবাদীরা সাধারণতঃ গোড়া হয়ে থাকে—তারা মনে করে, তাদের পথই একমাত্র পথ। ভারতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, আর তারা অত্যন্ত গোড়া। শৈবেরা আর একটি দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়; তাদের মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ নামক এক ভক্তের গল্প প্রচলিত আছে। সে শিবের এমন গোড়া ভক্ত ছিল যে, অপর কোন দেবতার নাম কানে শুনে না। পাছে অপর দেবতার নাম শুনে হয়, সেই ভয়ে সে দু কানে দুই ঘণ্টা বেঁধে রাখত। শিব তার প্রগাঢ় ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভাবলেন, শিব ও বিষ্ণুতে যে কোন প্রভেদ নেই, তা একে বুঝিয়ে দেব। সেইজন্ম তিনি তার কাছে অর্ক শিব, অর্ক বিষ্ণু অর্থাৎ হরিহর মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। সেই সময় ঘণ্টাকর্ণ তাঁকে আরতি করছিল। কিন্তু তার এমন গোড়ামি যে, যখন সে দেখলে, ধূপ-ধূনার গন্ধ বিষ্ণুর নাকে যাচ্ছে, তখন বিষ্ণু যাতে সেই সুগন্ধ উপভোগ করতে না পান, তজ্জন্ম তাঁর নাক চেপে ধরলে !

* * * *

মাংসানী প্রাণী, যেমন সিংহ, এক আঘাত করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু মহিষ বলদ সারাদিন চলেছে, চলতে চলতেই সে খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিচ্ছে। চঞ্চল, সদাক্রিয়মানীল 'ইয়াকী' (মার্কিন) ভাত থেকে চীনা কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না। যতদিন ক্ষত্রশক্তির প্রাধান্য থাকবে, ততদিন মাংসভোজন প্রচলিত

থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কমে যাবে, তখন নিরামিষাণীর দল প্রবল হবে।

* * * *

যখন আমরা ভগবানকে ভালবাসি, তখন যেন আমরা নিজেকে দুভাগ করে ফেলি—আমিই আমার অন্তরাত্মাকে ভালবাসি। ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আবার আমিও ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি। আমরা ঈশ্বরকে আমাদের অমুরূপ করে সৃষ্টি করে থাকি। আমরাই ঈশ্বরকে আমাদের প্রভু হবার জগৎ সৃষ্টি করে থাকি, ঈশ্বর আমাদের ঠাঁর দাস করেন না। যখন আমরা জানতে পারি, আমরা ঈশ্বরের সহিত এক, ঈশ্বর আমাদের সখা, তখনই প্রকৃত সাম্যাবস্থা লাভ হয়, তখনই আমাদের মুক্তি হয়। (সেই অনন্ত পুরুষ থেকে যতদিন তুমি আপনাকে এক চুলও তফাৎ করবে, ততদিন ভয় কখন দূর হতে পারে না)

ভগবৎ-সাধনা করে—ভগবানকে ভালবেসে জগতের কি কল্যাণ হবে, আহাম্মকের মত এই প্রশ্ন কখন করো না। চুলোয় যাক জগৎ, ভগবানকে ভালবাস—আর কিছু চেয়ো না। ভালবাস এবং অপর কিছু প্রত্যাশা করো না। ভালবাস—আর সব মত মতান্তর ভুলে যাও। প্রেমের পেয়লা পান করে পাগল হয়ে যাও। বল, 'হে প্রভু, আমি তোমারই—চিরকালের জগৎ তোমারই' এবং আর সব ভুলে গিয়ে কাঁপ দাও। ঈশ্বর বলতে যে প্রেম ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। একটা বিড়াল তার বাচ্চাদের ভালবেসে আদর করছে দেখে সেইখানে দাঁড়িয়ে

যাও, আর ভগবানের উপাসনা কর। সে স্থানে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এ কথা বিশ্বাস কর। সর্বদা বল, আমি তোমার, আমি তোমার; কারণ, আমরা সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করতে পারি। তাঁকে কোথাও খুঁজে বেড়িও না—তিনি ত প্রত্যক্ষ রয়েছেন, তাঁকে শুধু দেখে যাও “সেই বিশ্বাত্মা, জগজ্যোতিঃ প্রভু সর্বদা তোমাদের রক্ষা করুন।”

* * * *

নিগুণ পরব্রহ্মকে উপাসনা করা যেতে পারে না, সূতরাং আমাদেরই মত প্রকৃতিসম্পন্ন তাঁর প্রকাশবিশেষকে উপাসনা করতেই হবে। যীশু আমাদের মত মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন—তিনি খ্রীষ্ট হয়েছিলেন। আমরাও তাঁর মত খ্রীষ্ট হতে পারি, আর আমাদেরই মত তা হতেই হবে। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ অবস্থা বিশেষের নাম—যা আমাদের লাভ করতে হবে। যীশু ও গৌতমের মধ্যে সেই সেই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল। জগন্মাতা বা আত্মাশক্তিই ব্রহ্মের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ—তার পর খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তাঁ থেকে প্রকাশ হয়েছেন। আমরাই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা গঠন করে নিজেদের বদ্ধ করি, আবার আমরাই ঐ শিকল ছিঁড়ে মুক্ত হই। আত্মা অভয়স্বরূপ। আমরা যখন আমাদের আত্মার বহির্দেশে অবস্থিত ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন ভুলই করে থাকি, তবে আমরা যে কি করছি, তা জানি না। আমরা যখন

আম্বার স্বরূপ জানতে পারি, তখনই ঐ রহস্য বুঝি। একমুহুর্ত
প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

পারসিক সুফিদিগের কবিতায় আছে,—

“একদিন এমন ছিল, যখন আমি নারী ও তিনি পুরুষ ছিলেন।
উভয়ের মধ্যে ভালবাসা বাড়তে লাগল—শেষে তিনি বা আমি
কেউই রইলাম না। এখন এইটুকু মাত্র অস্পষ্টভাবে স্মরণ হয় যে,
একসময়ে দুজন পৃথক লোক ছিল; শেষে প্রেম এসে উভয়কে এক
করে দিলে।” *

জ্ঞান অনাদি অনন্তকাল বর্তমান—ঈশ্বর যতদিন আছেন,
জ্ঞানও ততদিন আছে। যে ব্যক্তি কোন আধ্যাত্মিক নিয়ম
আবিষ্কার করেন, তাঁকেই Inspired বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা
ঋষি বলে; তিনি যা প্রকাশ করেন, তাকে Revelation বা
অপৌরুষেয় বাক্য বলে। কিন্তু এরূপ অপৌরুষেয় বাক্যও
অনন্ত—এমন নয় যে এ পর্য্যন্ত যা হয়েছে তাতেই তা শেষ
হয়ে গেছে, এমন অন্ধভাবে তার অনুসরণ করতে হবে।

* হিন্দুদের বিজেতারা তাদের এত দিন ধরে সমালোচনা করে
এসেছে যে, এখন তারা নিজেরাই নিজদের ধর্ম সমালোচনা
করতে সাহস করে, আর তাইতে তাদের স্বাধীনচেতা করে

* শ্রীচৈতন্যের সহিত রায় রামানন্দের কথোপকথনেও এই ভাবের কথা
আছে—

না সো রমণ না হাম রমণী।

হৃদ মন মনোস্তব পেশল জানি। ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

দিয়েছে। তাদের বৈদেশিক শাসনকর্তারা অজ্ঞাতসারে তাদের পায়ের বেড়ী ভেঙে দিয়েছে। হিন্দুরা জগতের মধ্যে সব চেয়ে ধার্মিক জাতি হয়েও বাস্তবিকই ভগবন্নিদা বা ধর্মনিদা কাকে বলে, তা জানে না। তাদের মতে ভগবান্ বা ধর্মসম্বন্ধে যে কোন ভাবে আলোচনা করা হটক না, তাতেই পবিত্রতা ও কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। আর তারা অবতার বা শাস্ত্র বা ধর্মধ্বজিতার প্রতি কোন প্রকার কৃত্রিম শ্রদ্ধা বা ভক্তি দেখায় না।

খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায় খ্রীষ্টকে তাদের নিজের মতানুযায়ী করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় জীবনাদর্শে নিজেদের গড়বার চেষ্টা করেনি। এইজন্যই খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ উক্ত সম্প্রদায়ের সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার সহায় হয়েছিল, কেবল সেইগুলিকেই রাখা হয়েছিল। স্মরণ্যং সেই গ্রন্থগুলির উপর কখনই নির্ভর করা যেতে পারে না। আর এইরূপ গ্রন্থ বা শাস্ত্রোপাসনা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা—ওতে আমাদের হাত পা একেবারে বেঁধে রেখে দেয়। এদের মতে কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম, কি দর্শন—সকলকেই ঐ শাস্ত্রের মতানুযায়ী হতে হবে। প্রটেস্ট্যান্টদের এই বাইবেলের অত্যাচার সর্বাপেক্ষা ভয়ানক অত্যাচার। খ্রীষ্টীয়ান দেশসমূহে প্রত্যেকের মাথার উপর এক একটা প্রকাণ্ড গীর্জা চাপান রয়েছে, আর তার উপরে একখানা ধর্মগ্রন্থ,—কিন্তু তবুও মানুষ বেঁচে রয়েছে, আর তার উন্নতিও হচ্ছে। এতেই কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে, মানুষ ঈশ্বরস্বরূপ ?

জীবের মধ্যে মানুষই সর্বোচ্চ জীব, আর পৃথিবীই

সর্বোচ্চ লোক। আমরা ঈশ্বরকে মানুষের চেয়ে বড় বলে ধারণা করতে পারি না; সুতরাং আমাদের ঈশ্বর মানবভাবাপন্ন—আবার মানবও ঈশ্বরস্বরূপ। যখন আমরা মনুষ্যত্বের উপরে উঠে তার অতীত কোন উচ্চ বস্তুর সাক্ষাৎকার করি, তখন আমাদের এ জগৎ ছেড়ে, দেহ মন কর্তৃক এ সর্বেরই বাইরে লাফ দিতে হয়। আমরা যখন উচ্চ লাভ করে সেই অনন্তস্বরূপ হই, তখন আর আমরা এ জগতে থাকি না। আমাদের এই জগৎ ছাড়া অন্য কোন জগৎ জানবার সম্ভাবনা নেই, আর মানুষই এই জগতে সর্বোচ্চ সীমা। পশুদের সহজে আমরা যা জানতে পারি, তা সাদৃশ্যমূলক জ্ঞান। আমরা নিজেরা যা কিছু করে থাকি তা অনুভব করি, তাই দিয়ে আমরা তাদের বিচার করে থাকি।

সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি সর্বদাই সমান—কেবল সেটা কখন বেশী, কখন কম অভিব্যক্ত হয়, এই মাত্র। ঐ জ্ঞানের একমাত্র প্রস্রবণ আমাদের ভিতরে এবং কেবল সেইখানেই ঐ জ্ঞানলাভ করা যায়।

* * * *

সমুদয় কাব্য, চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীত কেবল ভাষার, রি ও ধ্বনির মধ্য দিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

* * * *

ধন্য তারা, যারা শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফলভোগ করে—তাদের হিসাব শীঘ্র শীঘ্র মিটে গেল। যাদের পাপের প্রতিফল

বিলম্বে আসে, তাদের মহা ছুদৈব—তাদের বেশী বেশী ভুগতে হবে !

যারা সমত্বভাবে লাভ করেছে, তারাই ব্রহ্মে অবস্থিত বলে কথিত হয়ে থাকে। সকল রকম ঘণার অর্থ—আত্মার দ্বারা আত্মার বিনাশ। সুতরাং প্রেমই জীবনের যথার্থ নিয়ামক। প্রেমের অবস্থা লাভ করাই সিদ্ধাবস্থা ; কিন্তু আমরা যতই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা কম কাজ (তথাকথিত) করতে পারি। সাধ্বিক ব্যক্তির জানে ও দেখে যে, সবই ছেলেখেলা মাত্র, সুতরাং তারা কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না।

এক ঘা দিয়ে দেওয়া সোজা কাজ, কিন্তু হাত গুটিয়ে স্থির হয়ে থেকে 'হে প্রভু, আমি তোমারই শরণাগত হলাম' বলা এবং তিনি ঘা হয় করুন বলে অপেক্ষা করে থাকা ভয়ানক কঠিন।

হেই জুলাই, শুক্রবার

যতক্ষণ তুমি সত্যের অনুরোধে যে কোন মুহূর্তে বদলাতে প্রস্তুত না হচ্ছ, ততক্ষণ তুমি কখনই সত্য লাভ করতে পারবে না ; অবশ্য তোমাকে দৃঢ়ভাবে সত্যের অনুসন্ধান লেগে থাকতে হবে।

* * * *

চার্কাকেরা ভারতের একটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়—তারা সম্পূর্ণ জড়বাদী ছিল। এখন সে সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছে, আর তাদের অধিকাংশ গ্রন্থও লোপ পেয়ে গেছে। তাদের মতে আত্মা

দেহ ও ভৌতিক শক্তি থেকে উৎপন্ন—সুতরাং দেহের নাশে
আত্মারও নাশ, এবং দেহনাশের পরও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে,
তার কোনও প্রমাণ নেই। তারা কেবল ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান
স্বীকার করত—অনুমান দ্বারাও যে জ্ঞানলাভ হতে পারে তা
স্বীকার করত না।

* * * *

সমাধি অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ ভাব, অথবা
সমত্বভাব লাভ করা।

* * * *

জড়বাদী বলেন, আমি মুক্ত বলে আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেটা
ভ্রমমাত্র। বিজ্ঞানবাদী বলেন, আমি বদ্ধ বলে যে জ্ঞান হয়, সেইটেই
ভ্রমমাত্র। বেদান্তবাদী বলেন, তুমি মুক্ত ও বদ্ধ দুইই। ব্যবহারিক
ভূমিতে তুমি কখনই মুক্ত নও, কিন্তু পারমাণবিক বা আধ্যাত্মিক
ভূমিতে তুমি নিত্যমুক্ত।

মুক্তি ও বন্ধন উভয়েরই পারে চলে যাও।

* আমরাই শিবস্বরূপ, অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ। প্রত্যেক
ব্যক্তির পশ্চাতে অনন্ত শক্তি রয়েছে; জগদম্বার কাছে প্রার্থনা
করলেই ঐ শক্তি তোমাতে আসবে।

“হে মাতঃ বাগীশ্বরী, তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি আমার জিহ্বার বাকরূপে
আবির্ভূতা হও।

“হে মাতঃ, বজ্র তোমার বাণীস্বরূপ—তুমি আমার ভিতর
আবির্ভূতা হও। হে কালি, তুমি অনন্ত কালরূপিণী, তুমিই অমোঘ
শক্তিস্বরূপিণী।”

৬ই জুলাই, শনিবার

(অশ্ব স্বামীজি ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের শাকরভাষ্য অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন ।)

শব্বরের মতে জগৎকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—
অম্মদ্ (আমি) ও যুগ্মদ্ (তুমি) । আর আলো ও অন্ধকার
যেমন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বস্তু, ঐ দুইটিও তদ্রূপ ; সুতরাং বলা বাহুল্য,
এ দুয়ের কোনটি থেকে অপরটি উৎপন্ন হতে পারে না । এই
আমি বা বিষয়ীর উপর তুমি বা বিষয়ের অধ্যাস হয়েছে ।
বিষয়ীই একমাত্র সত্য বস্তু, অপরটি অর্থাৎ বিষয় আপাত-
প্রতীয়মান সত্তামাত্র । ইহার বিরুদ্ধ মত, অর্থাৎ বিষয় সত্য
ও বিষয়ী মিথ্যা—এ মত কখন প্রমাণ করা যেতে পারে না ।
জড়পদার্থ ও বহির্জগৎ আত্মারই অবস্থাবিশেষ মাত্র । প্রকৃতপক্ষে
একটি সত্তাই রয়েছে ।

আমাদের অনুভূত এই জগৎ সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণে
উৎপন্ন । যেমন বল-সমান্তরিকে * দুই বিভিন্নমুখী বলপ্রয়োগের ফলে
একটি বস্তুতে কর্ণাভিমুখী গতির উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ এই সংসারও
আমাদের উপর প্রযুক্ত বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের ফলস্বরূপ ।
এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য ; কিন্তু আমরা জগৎকে সে ভাবে

* Parallelogram of forces—একটি সামান্তরিক ক্ষেত্রের সংলগ্ন
বাহুয়র যদি দুইটি বলের তীব্রতা ও গতিরৈখ্য লুচনা করে, তাহা হইলে উহার
কর্ণ দ্বারা ঐ দুইটি বলের সমবায় জনিত বলের তীব্রতা ও গতিরৈখ্য নিরূপিত
হইবে ।

দেখছি না; যেমন স্তম্ভিতে রজত-ভ্রম হয়, তেমনি আমাদেরও ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হয়েছে। একেই বলে অধ্যাস। যেমন পূর্বে আমরা একটি দৃশ্য দেখেছি, এখন সেইটে স্মরণ হল। যে সত্তা একটা সত্য বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তাকেই অধ্যাস্ত সত্তা বলে। সেই সময়ের জ্ঞান সেটা সত্য বলে বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। অথবা অধ্যাসের দৃষ্টান্ত অপরে এইরূপ দেন,—উষ্ণতা জলের ধর্ম নয়, অথচ যেমন আমরা জল উষ্ণ বলে কল্পনা করে থাকি। সুতরাং অধ্যাস মানে 'অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ'—যে বস্তু যা নয়, তাতে সেই বুদ্ধি করা। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা যখন জগৎ দেখছি, তখন আমরা সত্যকেই দর্শন করছি, কিন্তু মাঝখানে একটা আবরণ পড়েছে—তারই দ্বারা বিকৃতভাবাপন্ন করে দেখছি।

তুমি নিজেকে বাইরে প্রক্ষেপ না করে কখন নিজেকে জানতে পার না। ভ্রান্তি অবস্থায় আমাদের সামনের বস্তুগুলোকেই আমরা সত্য বলে মনে করি, অদৃষ্ট বস্তুকে কখন সত্য বলে আমাদের বোধ হয় না। এইরূপে আমরা বিষয়কে বিষয়ী বলে ভুল করে থাকি। আত্মা কিন্তু কখন বিষয় হন না। মন হচ্ছে অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় আর বহিরিন্দ্রিয়গুলি তারই হাতের যন্ত্রস্বরূপ। বিষয়ীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বহিঃপ্রক্ষেপ-শক্তি (Objectifying power) আছে—তাইতে তিনি 'আমি আছি' বলে আপনাকে জানতে পারেন। কিন্তু সেই আত্মা বা বিষয়ী নিজেরই বিষয়, মন বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নন। তবে আমরা একটা ভাবকে (idea) আর একটা ভাবের উপর

অধ্যাস করতে পারি—যেমন আমরা যখন বলি 'আকাশ নীল',—
আকাশটা একটা ভাব মাত্র, আর নীলত্বও একটা ভাব—আমরা
নীলত্ব ভাবটা আকাশের উপর আরোপ বা অধ্যাস করে
থাকি।

বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা বা জ্ঞান ও অজ্ঞান—এই দুই নিয়ে
জগৎ, কিন্তু আত্মা কোন কালে অবিজ্ঞাচর হন না। আপেক্ষিক
জ্ঞানও ভাল, কারণ, সেটা সেই চরম জ্ঞানে আরোহণের সোপান।
কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞান বা মানসিক জ্ঞান, এমন কি, বেদপ্রমাণজ্ঞ
জ্ঞানও কখন পরমার্থ সত্য হতে পারে না; কারণ, ঐগুলি সবই
আপেক্ষিক জ্ঞানের সীমার ভিতর। প্রথমে 'আমি দেহ' এই
ভ্রম দূর করে দাও, তবেই যথার্থ জ্ঞানের আকাজকা হবে।
মানবীয় জ্ঞান পশুজ্ঞানেরই উচ্চতর অবস্থামাত্র।

* * * * *

বেদের এক অংশে কর্মকাণ্ড—নানাবিধ অনুষ্ঠানপদ্ধতি,
যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির উপদেশ আছে। অপরাংশে ব্রহ্মজ্ঞান ও
যথার্থ আধ্যাত্মিক ধর্মের বিষয় বর্ণিত আছে। বেদের এই ভাগ
আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন, আর সেই জন্মই বেদের ঐ ভাগের
জ্ঞান যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞানের অতি সমীপবর্তী। সেই অনন্ত
পূর্ণ পরব্রহ্মের জ্ঞান কোন শাস্ত্রের উপর বা অপর কিছুর উপর
নির্ভর করে না; এই জ্ঞান স্বয়ং পূর্ণস্বরূপ। বহু শাস্ত্র পাঠেও
এই জ্ঞান লাভ হয় না; এ কোন মতবিশেষ নয়, এ জ্ঞান
অপরোক্ষানুভূতিস্বরূপ। আশির উপর যে ময়লা রয়েছে, তা

পরিষ্কার করে ফেল। (নিজের মনটাকে পবিত্র কর, তা হলেই
নন্দ করে তোমার এই জ্ঞানের উদয় হবে যে, তুমি ব্রহ্ম।)

শুধু ব্রহ্মই আছেন—জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট
নেই, নরহত্যা নেই, কোনরূপ পরিণাম নেই, ভালও নেই,
মন্দও নেই, সবই আমরা বন্ধুতে সর্পভ্রম করছি—ভ্রম আমাদেরই।
আমরা তখনই কেবল জগতের কল্যাণ করতে পারি, যখন
আমরা ভগবানকে ভালবাসি এবং তিনিও আমাদের ভালবাসেন।
হত্যাকারী ব্যক্তিও ব্রহ্মস্বরূপ—তার উপর হত্যাকারীরূপ যে
আবরণ রয়েছে, সেটা তাতে অধাস্ত বা আরোপিত হয়েছে মাত্র।
তাকে আস্তে আস্তে হাত ধরে এই সত্য জানিয়ে দাও।

আত্মাতে কোন জাতিভেদ নেই; 'আছে' ভাবাটাই ভ্রম।
সেই রকম 'আত্মার জীবন বা মরণ বা কোন প্রকার গতি বা গুণ
আছে' ভাবাও ভ্রম। আত্মার কখনও পরিণাম হয় না, আত্মা
কখনও যানও না, আসেনও না। তিনি তাঁর নিজের সমুদয়
প্রকাশগুলির অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ, কিন্তু আমরা তাঁকে ঐ ঐ
প্রকাশ বলে মনে করছি। এ এক অনাদি অনন্ত ভ্রম চিরকাল
ধরে চলেছে। তবে বেদকে আমাদের ভূমিতে নেমে এসে
আমাদের উপদেশ দিতে হচ্ছে, কারণ, বেদ যদি উচ্চতম সত্যকে
উচ্চতম ভাবে বা ভাষায় আমাদের কাছে বক্তেন তা হলে
আমরা বুঝতেই পারতাম না।

স্বর্গ আমাদের বাসনাসৃষ্ট কুসংস্কার মাত্র, আর বাসনা
চিরকালই বন্ধন—অবনতির দ্বারস্বরূপ। ব্রহ্মদৃষ্টি ছাড়া আর
কোন ভাবে কোন বস্তুকে দেখা না। তা যদি কর, তা হলে

অন্টার বা মন্দ দেখ্বে ; কারণ, আমরা যে বস্তু দেখ্তে পাই, তার উপর একটা ভ্রমাত্মক আবরণ প্রক্ষেপ করি, তাই মন্দ দেখ্তে পাই। এই সব ভ্রম হতে মুক্ত হও এবং পরমানন্দ উপভোগ কর। সব রকম ভ্রমমুক্ত হওয়াই মুক্তি।

এক হিসাবে সকল মানুষই ব্রহ্মকে জানে ; কারণ, সে জানে, “আমি আছি” ; কিন্তু মানুষ নিজের যথার্থ স্বরূপ জানে না। আমরা সকলেই জানি যে আমরা আছি, কিন্তু কি করে আছি, তা জানি না। অদ্বৈতবাদ ছাড়া জগতের অন্টার নিম্নতর ব্যাখ্যা আংশিক সত্যমাত্র। কিন্তু বেদের তত্ত্ব এই যে, আমাদের প্রত্যেকের ভিতর যে আত্মা রয়েছে, তা ব্রহ্মস্বরূপ। জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে বা কিছু—সব জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আমাদের অপরোক্ষানুভূতি বেদেরও অতীত ; কারণ, বেদেরও প্রামাণ্য ঐ অপরোক্ষানুভূতির উপর নির্ভর করে। সর্বোচ্চ বেদান্ত হচ্ছে প্রপঞ্চাতীত সত্তার তত্ত্বজ্ঞান।

সৃষ্টির আদি আছে বললে, সর্বপ্রকার দার্শনিক বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

জগৎপ্রপঞ্চাত্মগত অব্যক্ত ও ব্যক্ত শক্তিকে মায়া বলে। যতক্ষণ সেই মাতৃস্বরূপিনী মহামায়া আমাদের ছেড়ে না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা মুক্ত হতে পারি না।

জগৎটা আমাদের সন্তোষের জন্ম পড়ে রয়েছে ; কিন্তু কখন কিছুর অভাব বোধ করো না। অভাব বোধ করাটা দুর্বলতা, অভাব বোধেই আমাদের ভিক্ষুক করে ফেলে। কিন্তু আমরা কি ভিক্ষুক ? আমরা রাজপুত্র !

এই জুলাই, রবিবার, প্রাতঃকাল

অনন্ত জগৎপ্রপঞ্চকে যতই ভাগ করা যাক না কেন, তা
অনন্তই থাকে, আর তার প্রত্যেক ভাগটাও অনন্ত।

পরিণামী ও অপরিণামী, ব্যক্ত ও অব্যক্ত—উভয় অবস্থাতেই
ব্রহ্ম এক। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে এক বলে জেনো। জ্ঞাতা, জ্ঞান
ও জ্ঞেয়—এই ত্রিপুরী জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। যোগী
ধ্যানে যে ঈশ্বরের দর্শন করেন, তা তিনি নিজ আত্মার শক্তিতেই
দেখে থাকেন।

আমরা যাকে স্বভাব বা অদৃষ্ট বলি, তা কেবল ঈশ্বরেচ্ছা
মাত্র। যতদিন ভোগসুখ খোঁজা যায়, ততদিন বন্ধন থেকে যায়।
যতক্ষণ অপূর্ণ থাকা যায়, ততক্ষণই ভোগ সম্ভব; কারণ,
ভোগের অর্থ অপূর্ণ বাসনার পরিপূর্তি। জীবাত্মা প্রকৃতিকে
সন্তোষ করে থাকে। প্রকৃতি, জীবাত্মা ও ঈশ্বর—এদের
অন্তর্নিহিত* সত্য হচ্ছেন ব্রহ্ম। কিন্তু যতদিন আমরা তাঁকে
প্রকাশ না করি ততদিন তাঁকে আমরা দেখতে পাই না।
যেমন বর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করতে পারা যায়, তেমনি
ব্রহ্মকেও মন্বনের দ্বারা প্রকাশ করতে পারা যায়। দেহটাকে
নিম্ন অরণি, প্রণব বা ওঙ্কারকে উত্তরারণি বলে কল্পনা কর, আর
ধ্যান যেন মন্বনস্বরূপ।* তা হলে আত্মার মধ্যে যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ
অগ্নি আছে, তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তপস্বী দ্বারা এইটে
করতে চেষ্টা কর। দেহকে সরলভাবে রেখে ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে

* আত্মানমরণিং কৃৎ প্রণবং চোত্তরারণিম্।

ধ্যাননির্মূর্ধনাত্মাস্তাদ্বেং পশ্চেন্নিগূঢ়বৎ।—ব্রহ্মোপনিষৎ।

আছতি দাও। ইন্দ্রিয়কেন্দ্রগুলি সব ভিতরে, তাদের যন্ত্র বা গোলকগুলি কেবল বাহিরে। সুতরাং তাদের জোর করে মনে প্রবেশ করিয়ে দাও। তারপর ধারণার সহায়ে মনকে ধ্যানে স্থির কর। যেমন ছুধের ভিতর সর্বত্র বি রয়েছে, ব্রহ্মও তদ্রূপ জগতের সর্বত্র রয়েছে। কিন্তু মন দ্বারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন করলে ছুধের মাখন উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।*

সমুদয় হিন্দুদর্শন বলেন, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় ছাড়া একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। তাই দিয়েই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে।

* * * *

জগৎটা একটা অবিরাম গতিস্বরূপ; আর ঘর্ষণ (Friction) হতেই কালে সমুদয়ের নাশ হবে; তারপর দিন কতক বিশ্রাম হয়ে আবার সব আরম্ভ হবে।

যতদিন এই 'জগন্ময়' মানুষকে বেষ্টন করে থাকে, অর্থাৎ যতদিন সে আপনাকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে, ততদিন সে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না।

রবিবার, অপরাহ্ন

ভারতে ছটি দর্শনকে আস্তিকদর্শন বলে; কারণ, তারা বেদে বিশ্বাসী।

* সূতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে বসতি চ বিজ্ঞানম্

সততং মনুয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন।—ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ, ২০।

ব্যাসের দর্শন বিশেষভাবে উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সূত্রাকারে অর্থাৎ যেমন বীজগণিতশাস্ত্রে খুব সংক্ষেপে কয়েকটা অঙ্কের সাহায্যে ভাবপ্রকাশ করা হয়, তেমনি ভাবে এটা লিখেছিলেন,—এতে কল্পা তিন্মা বড় একটা নেই। ব্যাসসূত্র এইরূপ সংক্ষেপে রচিত হওয়ার, শেষে তার অর্থ বুঝতে এত গোল হল যে ঐ এক সূত্র থেকেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এক অদ্বৈতবাদ বা “বেদান্ত-কেশরী”র উৎপত্তি হল। আর এই সব বিভিন্ন মতের বড় বড় ভাষ্যকারেরা বেদের অক্ষররাশিকে তাঁদের দর্শনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য সময়ে সময়ে জেনে-শুনে মিথ্যাবাদী হয়েছেন।

উপনিষদে কোন ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপের ইতিহাস অতি অল্পই পাওয়া যায়; কিন্তু অন্যান্য প্রায় সকল শাস্ত্রই প্রধানতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের ইতিহাস।

বেদে প্রায় শুধু দার্শনিক তত্ত্বেরই আলোচনা আছে। দর্শন-বর্জিত ধর্ম কুসংস্কারে গিয়ে দাঁড়ায়, আবার ধর্মবর্জিত দর্শন শুধু নাস্তিকতার পরিণত হয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মানে অদ্বৈতবাদ, কিন্তু বিশেষযুক্ত তার ব্যাখ্যাতা রামানুজ। তিনি বলেন, “বেদরূপ ক্ষীরসুদ মগুন করে ব্যাস মানবজাতির কল্যাণের জন্য এই বেদান্তদর্শনরূপ মাখন তুলেছেন।” তিনি আরও বলেছেন, “জগৎপ্রভু ব্রহ্ম অশেষকল্যাণ-গুণ-সমন্বিত পুরুষোত্তম।” মধব পুরো-দস্তুর দ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত বেদপাঠে অধিকার আছে। তিনি প্রধানতঃ পুরাণ থেকে তাঁর মত স্থাপনের জন্য

যোক উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, ব্রহ্ম নামে কিছু—শিব
নাম ; কারণ, কিছু ভিন্ন মূর্তিদাতা আর কেউ নেই।

৮ই জুলাই, সোমবার

মধ্যাচার্যের ব্যাখ্যার ভিতর বিচারের স্থান নেই—তিনি
শাস্ত্রপ্রমাণেই সব গ্রহণ করেছেন।

রামানুজ বলেন, বেদই সর্বাধিক পবিত্র পঠনীয় গ্রন্থ।
ত্রৈবিক অর্গাৎ ব্রাহ্মণ, কল্পিত ও বৈশ্ব এই তিন উচ্চবর্ণের
মস্তানদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর অষ্টম, নবম বা একাদশ বর্ষ
বয়সে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করা উচিত। বেদাধ্যয়নের অর্থ
গুরুগৃহে গিয়ে নিরমিত স্বর ও উচ্চারণের সহিত বেদের শব্দরাশি
আগন্তু কর্তব্য করা।

জপের অর্থ ভগবানের পবিত্র নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ; এই
জপ করতে করতে সাধক ক্রমে ক্রমে সেই অনন্তরূপে উপনীত
হন। যাগযজ্ঞাদি যেম অদৃঢ় মৌকা বা তেলাস্বরূপ। ব্রহ্মকে
জানতে হলে ঐ যাগযজ্ঞাদি ছাড়া আরও কিছু চাই। আর
ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি। মুক্তি আর কিছু নয়—অজ্ঞানের বিনাশ ;
ব্রহ্মজ্ঞানেই এই অজ্ঞানের বিনাশ হয়। বেদান্তের তাৎপর্য
জানতে গেলে যে এই সব যাগযজ্ঞ কর্তব্য হবে, তার কোন নামে
নেই ; কেবল গুরুর জপ করলেই যথেষ্ট।

ভেদদর্শনই সমুদয় দুঃখের কারণ, আর অজ্ঞানই এই
ভেদদর্শনের কারণ। এই কারণেই যাগযজ্ঞাদি অদৃষ্ঠানের কোন

প্রয়োজন নেই ; কারণ, তাতে আরও ভেদজ্ঞান বাড়িয়ে দেয়।
ঐ সকল যাগযজ্ঞাদির উদ্দেশ্য কিছু (ভোগস্বখ) লাভ করা—
অথবা কোন কিছু (দুঃখ) থেকে নিস্তার পাওয়া।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, আত্মাই ব্রহ্ম, এবং আমরাই সেই আত্মস্বরূপ—

এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারাই সকল ভ্রান্তি দূর হয়। এই তত্ত্ব
প্রথম শুনতে হবে, পরে মনন অর্থাৎ বিচার দ্বারা ধারণা করতে
হবে, অবশেষে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে হবে। মনন অর্থে
বিচার করা—বিচার দ্বারা, যুক্তিতর্কের দ্বারা ঐ জ্ঞান নিজের
ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা। প্রত্যক্ষানুভূতি ও সাক্ষাৎকার অর্থে
সর্বদা চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা তাঁকে আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত
করে ফেলা। এই অবিরাম চিন্তা বা ধ্যান যেন একপাত্রে
হতে অপর পাত্রে প্রক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত। ধ্যান
দিবারাত্র মনকে ঐ ভাবের মধ্যে রেখে দেয়, এবং তাইতে
আমাদের মুক্তিলাভ করতে সাহায্য করে। সর্বদা 'সোহং'
'সোহং' এই চিন্তা কর—এইরূপ অহরহ চিন্তা মুক্তির প্রায়
কাছাকাছি। দিবারাত্র বল—'সোহং 'সোহং'। এইরূপ
সর্বদা চিন্তার ফলে অপরোক্ষানুভূতি লাভ হবে। ভগবানকে
এইরূপ তন্ময়ভাবে সদাসর্বদা স্মরণের নামই ভক্তি।

সব রকম শুভকর্ম এই ভক্তিলাভ করতে গৌণভাবে সাহায্য
করে থাকে। শুভ চিন্তা ও শুভ কার্য—অশুভ চিন্তা ও অশুভ
কর্ম অপেক্ষা কম ভেদজ্ঞান উৎপাদন করে, সুতরাং গৌণভাবে
এরা মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। কর্ম কর, কিন্তু কর্মফল ভগবানে
অর্পণ কর। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণতা বা সিদ্ধাবস্থা লাভ

হয়। যিনি ভক্তিপূর্বক সত্যস্বরূপ ভগবানের মাখনা করেন, তাঁর কাছে সেই সত্যস্বরূপ ভগবান্ প্রকাশিত হন।

* * * * *

আমরা যেন প্রদীপস্বরূপ, আর ঐ প্রদীপের জ্বালাটাই হচ্ছে আমরা যাকে 'জীবন' বলি। যখনই অজ্ঞান কুরিয়ে যাবে, তখনই আলোটাও নিবে যাবে। আমরা কেবল প্রদীপটাকে সাফ রাখতে পারি। জীবনটা কতকগুলি জিনিষের মিশ্রণস্বরূপ, এটা একটা কার্যস্বরূপ, সুতরাং উহা অবশ্যই ওর উপাদান কারণগুলিতে লয় হবে।

৯ই জুলাই, মঙ্গলবার

আত্মা হিসাবে মানুষ বাস্তবিকই মুক্ত, কিন্তু মানুষ হিসাবে সে বন্ধ, প্রত্যেক ভৌতিক অবস্থাদ্বারা সে পরিণাম পাচ্ছে। মানুষ হিসাবে তাকে একটা যন্ত্রবিশেষ বলা যায়, শুধু তার ভিতর একটা মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব আছে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু জগতের সব শরীরের মধ্যে এই মনুষ্য শরীরই সর্বশ্রেষ্ঠ শরীর, আর মনুষ্য মনই সর্বশ্রেষ্ঠ মন। যখন মানব আত্মোপলব্ধি করে, তখন সে আবশ্যিকমত যে কোন শরীর ধারণ করতে পারে; তখন সে সব নিয়মের পার। এটা প্রথমতঃ একটা উক্তিমাত্র; একে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কার্যে এটা নিজে নিজে প্রমাণ করে দেখতে হবে; আমরা নিজের মনকে বুঝাতে পারি, কিন্তু অপরের মনকে বুঝাতে পারি না। ধর্মবিজ্ঞানের মধ্যে একমাত্র রাজযোগই প্রমাণ করা যেতে পারে,—আর আমি যা নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে ঠিক বলে

জেনেছি, তাই শুধু শিক্ষা দিয়ে থাকি। বিচার-শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থাই অপরোক্ষ জ্ঞান, কিন্তু তা কখন যুক্তিবিরোধী হতে পারে না।

কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, সুতরাং কর্ম বিদ্যা বা জ্ঞানের সহায়ক। বৌদ্ধদের মতে মানব ও তির্য্যগ্জাতির হিতসাধনই একমাত্র কর্ম; ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদের মতে উপাসনা ও সর্বপ্রকার যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানও ঠিক সেইরূপই কর্ম, এবং চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। শঙ্করের মতে, “শুভাশুভ সর্বপ্রকার কর্মই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।” যে সকল কার্য অজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো পাপ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয়, কিন্তু কারণস্বরূপে—যেহেতু তাদের দ্বারা রজঃ ও তমঃ বেড়ে যায়। সত্ত্বের দ্বারাই কেবল জ্ঞানলাভ হয়। পুণ্য বা শুভকর্মের দ্বারা জ্ঞানের আবরণ দূর হয়, আর কেবল জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বর দর্শন হয়।

জ্ঞান কখন উৎপাদন করা যেতে পারে না, তাকে কেবল আবিষ্কার করা যেতে পারে; আর যে কোম ব্যক্তি কোন বড় আবিষ্ক্রিয়া করেন, তাঁকেই প্রত্যাদিষ্ট (Inspired) পুরুষ বলা যেতে পারে। কেবল, যদি তিনি আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করেন, আমরা তাঁকে ঋষি বা অবতার বলি; আর যখন সেটা কোন জড়জগতের সত্য হয়, তখন তাঁকে বৈজ্ঞানিক বলি। আর যদিও সকল সত্যের মূল সেই এক ব্রহ্মই, তথাপি আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীকে উচ্চতর আসন দিয়ে থাকি।

শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম সর্বপ্রকার জ্ঞানের সার, তার ভিত্তিস্বরূপ, আর জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়রূপ যে অভিব্যক্তি, তা ব্রহ্মোতে

কাল্পনিক ভেদমাত্র। রামানুজ ব্রহ্মে জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। খাঁটি অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মে কোন গুণই স্বীকার করেন না—এমন কি সত্তা পর্য্যন্ত। নয়—সত্তা বলতে আমরা যাই কেন বুঝি না। রামানুজ বলেন, আমরা সচরাচর বাক্যে জ্ঞান বলি, ব্রহ্ম তারই সারস্বরূপ। অব্যক্ত বা সাম্যতাবাপন্ন জ্ঞান ব্যক্ত বা বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হলেই জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি।

* * * *

জগতের উচ্চতম দার্শনিক ধর্মসমূহের মধ্যে অগ্রতম—বৌদ্ধধর্ম ভারতের আপামর সাধারণ সকলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল। ভেবে দেখ দেখি—আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আর্য্যদের সভ্যতা ও শিক্ষা কি অদ্ভুত ছিল—যাতে তারা ঐরূপ উচ্চ উচ্চ ভাবের ধারণা করতে পেরেছিল!

ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই জাতিভেদ স্বীকার করেন নি, আর এখন ভারতে একজনও বৌদ্ধ দেখতে পাওয়া যায় না। অগ্ণাণ দার্শনিকেরা সকলেই অল্পবিস্তর সামাজিক কুসংস্কারগুলোর ধামাধরা ছিলেন; তাঁরা যতই উচ্চতায় উঠে থাকুন না কেন, তাঁদের মধ্যে একটু আধটু চিল শকুনির ভাব ছিলই। গুরু মহারাজ যেমন বলতেন, “চিল শকুনি এত উচ্চতায় ওঠে যে, তাদের দেখা যায় না, কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ে, কোথায় এক টুকরা পচা মাংস পড়ে আছে।”

* * * *

প্রাচীন হিন্দুরা অদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন—যেন জীবন্ত বিশ্বকোষ।

আর মানুষ যেমন নিঃশ্বাসের দ্বারা বায়ু বাইরে প্রক্ষেপ করে, সেইরূপ বেদও তার ভেতর থেকে প্রকাশিত হয়েছে ; সেই জন্তই আমরা জানতে পারি, তিনি সৰ্বশক্তিমান ও সৰ্বজ্ঞ । তিনি জগৎ সৃষ্টি করে থাকুন বা না থাকুন, তাতে বড় কিছু আসে যায় না ; কিন্তু তিনি যে বেদ প্রকাশ করেছেন, এইটেই বড় জিনিস । বেদের সাহায্যেই জগৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানতে পেরেছ—তাকে জানবার আর অন্য উপায় নেই ।

শঙ্করের এই মত, অর্থাৎ বেদ সমুদয় জ্ঞানের খনি—এটা সমগ্র হিন্দুজাতির এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে একটা প্রবাদ এই যে, বেদে গুরু হারালেও গুরু পাওয়া যায় ।

শঙ্কর আরও বলেন, কর্মকাণ্ডের বিধিনিষেধ মেনে চলাই জ্ঞান নয় । ব্রহ্মজ্ঞান কোন প্রকার নৈতিক বাধ্যবাধকতা, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বা আমাদের মতামতের উপর নির্ভর করে না ; যেমন একটা স্থাণুকে একজন ভূত মনে করছে বা অপর একজন স্থাণুজ্ঞান করছে, তাতে স্থাণুর কিছু আসে যায় না ।

আমাদের বেদান্তবেত্তা জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ, বিচার বা শাস্ত্রদ্বারা আমাদের ব্রহ্ম উপলব্ধি হতে পারে না । তাঁকে সমাধি দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে, আর বেদান্তই ঐ অবস্থা লাভের উপায় দেখিয়ে দেয় । আমাদের সমস্ত ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ভাব অতিক্রম করে সেই নিঃশূন্য ব্রহ্মে পৌঁছতে হবে । প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্রহ্মকে অনুভব করছে ; ব্রহ্ম ছাড়া আর অনুভব করবার দ্বিতীয় বস্তুই নেই । আমাদের ভিতর যেটা 'আমি' 'আমি' করছে, সেইটাই ব্রহ্ম । কিন্তু যদিও আমরা দিনরাত তাঁকে

অনুভব করছি, তথাপি আমরা জানি না যে, তাঁকে অনুভব করছি। যে মুহূর্তে আমরা ঐ সত্য জানতে পারি, সেই মুহূর্তেই আমাদের সব চুঃখ কষ্ট চলে যায়; সুতরাং আমাদের ঐ সত্যকে জানতেই হবে। এক্ষণে অবস্থা লাভ কর, তা হলে আর দ্বৈততাব আসবে না। কিন্তু যাগযজ্ঞাদি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না; আত্মাকে অন্বেষণ, উপাসনা এবং সাক্ষাৎকার করা, এই সকলের দ্বারাই সেই জ্ঞান লাভ হবে।

ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা—অপরা বিদ্যা হচ্ছে বিজ্ঞান। মুণ্ডকোপনিষদ (সন্ন্যাসীদের জন্য উপদিষ্ট উপনিষদ) এই উপদেশ দিচ্ছেন। দুই প্রকার বিদ্যা আছে—পরা ও অপরা। তন্মধ্যে বেদের যে অংশে দেবোপাসনা ও নানাবিধ যাগযজ্ঞের উপদেশ—সেই কন্দকাণ্ড এবং সর্ববিধ লৌকিক জ্ঞানই অপরা বিদ্যা। যজ্ঞারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ হয়, তাই পরা বিদ্যা। সেই অক্ষর পুরুষ নিজের মধ্য থেকেই সমুদয় সৃষ্টি কচ্ছেন—বাইরের অপর কিছু তাঁর উপর কার্য্য কচ্ছে না। সেই ব্রহ্মই সমুদয় শক্তিস্বরূপ, ব্রহ্মই বা কিছু আছে সব। যিনি আত্মযাজী, তিনিই কেবল ব্রহ্মকে জানেন। অজ্ঞানেরাই বাহু পূজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে; অজ্ঞানেরাই মনে করে, কর্ষের দ্বারা আমাদের ব্রহ্মলাভ হতে পারে। ধারা সুষুম্নাবর্ত্তে (যোগীদের মার্গে) গমন করেন, তাঁরাই শুধু আত্মাকে লাভ করেন। এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করতে হলে গুরুর কাছে যেতে হবে। সমষ্টিতেও বা আছে, ব্যষ্টিতেও তাই আছে; সমুদয়ই আত্মা থেকে প্রসূত হয়েছে। ওঙ্কার হচ্ছে যেন ধনু, আত্মা হচ্ছে যেন তীর, আর ব্রহ্ম হচ্ছেন

লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হয়ে তাঁকে বিদ্ধ করতে হবে। তাঁতে যিশে এক হয়ে যেতে হবে।* সসীম অবস্থায় আমরা সেই অসীমকে কখনও প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু আমরাই সেই অসীমস্বরূপ। এইটি জানলে আর কারও সঙ্গে তর্কবিতর্কের দরকার হয় না।

ভক্তি, ধ্যান ও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবধানঃ।" সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার কখনই জয় হয় না। সত্যের ভিতর দিয়েই ব্রহ্মলাভের একমাত্র পথ রয়েছে; কেবল সেখানেই প্রেম ও সত্য বর্তমান।

১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার

মায়ের ভালবাসা ব্যতীত কোন সৃষ্টিই স্থায়ী হতে পারে না। জগতের কোন কিছুই সম্পূর্ণ জড়ও নয়, আবার সম্পূর্ণ চিৎও নয়। জড় ও চিৎ পরস্পরসাপেক্ষ—একটা ছাড়াই অপরটার ব্যাধা হয়। এই পরিদৃশ্যমান জগতের যে একটা ভিত্তি আছে, এ বিষয়ে সকল আন্তিকই একমত,—কেবল সেই ভিত্তিহীনীয় বস্তুর প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধেই তাঁদের মতভেদ। জড়বাদের জগতের ঐরূপ কোন ভিত্তি আছে বলেই স্বীকার করে না।

সকল ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান

* প্রণবো ধনুঃ শরো হাশ্বা ব্রহ্ম তন্নাম্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদব্যং পরবত্তম্যয়ো ভবেৎ ।—মুণ্ডক, ২, ২. ৪ ।

অতিক্রম করলে হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ—এমন কি, যারা কোন প্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলেরই ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে।

* * * * *

যীশুর দেহত্যাগের পঁচিশ বৎসর পরে তৎ-শিষ্য টমাস (Apostle Thomas) কর্তৃক জগতের মধ্যে সব চেয়ে বিস্তৃত খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এক্সলো-সাকসনরা (Anglo-Saxon) তখনও অসভ্য ছিল—গায়ে চিত্র বিচিত্র আঁকত ও পর্কতগুহার বাস করত। এক সময়ে ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ খ্রীষ্টিয়ান ছিল, কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ হবে।

খ্রীষ্টধর্ম চিরকালই তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য, খ্রীষ্টের গায় নিরীহ মহাপুরুষের শিষ্যেরা এত নরহত্যা করেছে! বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম, জগতে এই তিনটিই প্রচারশীল ধর্ম। এদের পূর্ববর্তী তিনটি ধর্ম, যথা—হিন্দু, ব্রাহ্মদী ও জরতুষ্ট্রের (পারসী ধর্ম) কখনও প্রচার দ্বারা দলপুষ্টি করতে চেষ্টা করেনি। বৌদ্ধেরা কখনও নরহত্যা করেনি, তথাপি তারা শুধু কোমল ব্যবহারের দ্বারা এক সময় জগতের তিন-চতুর্থাংশ লোককে নিজমতে নিয়ে এসেছিল।

বৌদ্ধেরা ছিল সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত অজ্ঞেয়বাদী। বাস্তবিকই, শূন্যবাদ বা অদ্বৈতবাদ, এই দুয়ের মাঝখানে যুক্তি কোথাও দাঁড়াতেই পারে না। বৌদ্ধেরা বিচারের দ্বারা সব কেটে দিয়েছিল—তারা তাদের মত যুক্তিতে বতদূর নিয়ে যাওয়া চলে তা নিয়ে গিয়েছিল।

অদ্বৈতবাদীরাও তাদের মত যুক্তির চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই এক অঞ্চল অল্প ব্রহ্মবস্তুতে পৌঁছেছিল—যা থেকে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হচ্ছে। বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবাদী উভয়েরই একই সময়ে একত্ব ও বহুত্ব বোধ আছে। এই দুটি অনুভূতির মধ্যে একটি সত্য অপরটি মিথ্যা হবেই। শূন্যবাদী বলেন, বহুত্ববোধ সত্য; অদ্বৈতবাদী বলেন, একত্ববোধই সত্য; সমগ্র জগতে এই বিবাদই চলেছে। এই নিয়েই ধস্তাধস্তি (tug of war) চলেছে।

অদ্বৈতবাদী জিজ্ঞাসা করেন, শূন্যবাদী কোথাও একত্বের ভাব পান কি করে? ঘূর্ণ্যমান আলোটা বৃত্তাকার মনে হয় কি করে? একটা স্থিতি স্বীকার করলে তবেই না গতির ব্যাখ্যা হতে পারে? সব জিনিসের পশ্চাতে একটা অঞ্চল সত্তা প্রতীয়মান হচ্ছে; সেটা শূন্যবাদী বলেন ভ্রমমাত্র—কিন্তু এরূপ ভ্রমোৎপত্তির কারণ কি, তা তিনি কোনরূপে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। আবার অদ্বৈতবাদীও বোঝাতে পারেন না যে, এক বহু হল কি করে। এর ব্যাখ্যা কেবলমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত অবস্থায় গেলেই পাওয়া যেতে পারে। আমাদের তুরীয় ভূমিতে উঠতে হবে, একেবারে, অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যেতে হবে। উক্ত অবস্থায় যাবার শক্তি যেন একটি যন্ত্র-স্বরূপ, আর ঐ যন্ত্রের ব্যবহার অদ্বৈতবাদী করায়ত্ত। তিনিই ব্রহ্মসত্তাকে অনুভব করতে সমর্থ; বিবেকানন্দ নামক মানুষটা নিজেকে ব্রহ্মসত্তাতে পরিণত করতে পারে, আবার সেই অবস্থা থেকে মানবীয় অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। স্মৃতরাং তার পক্ষে জগৎসমস্তার মীমাংসা হয়ে গেছে, আর গৌণভাবে

অপরের পক্ষেও ঐ মীমাংসা হয়ে গেছে ; কারণ, সে অপরকে ঐ অবস্থায় পৌঁছবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে। এইরূপে বোঝা যাচ্ছে, যেখানে দর্শনের শেষ, সেখানে ধর্মের আরম্ভ। আর এইরূপ উপলব্ধি দ্বারা জগতের কল্যাণ এই হবে যে, এখন যা জ্ঞানাতীত রয়েছে, কালে তা সর্বসাধারণের পক্ষে জ্ঞানগম্য হয়ে যাবে। সুতরাং জগতের ধর্মলাভই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য ; আর মানব অজ্ঞাতসারে এইটে অনুভব করেছে বলেই সে আবহমান কাল ধর্মভাবকে আশ্রয় করে রয়েছে।

ধর্ম যেন বহুগুণশালিনী পরশ্বিনী গাভী ; সে অনেক লাখি মেরেছে, কিন্তু তাতে কি ? সে অনেক দুধও দেয়। যে গরুটা দুধ দেয়, গোয়ালী তার লাখি সহ করে যায়।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে আছে, মহামোহ ও বিবেক এই দুই রাতায় লড়াই বেধেছিল। বিবেক রাজার সম্পূর্ণ জিত আর হয় না। অবশেষে বিবেক রাজার সঙ্গে উপনিষৎ দেবীর পুনর্মিলন হয়, এবং তাঁদের প্রবোধরূপ পুত্রের জন্ম হল। আর সেই পুত্রের প্রভাবে তাঁর শত্রু বলে আর কেউ রইল না। তখন তাঁরা পরমসুখে বাস করতে লাগলেন। আমাদের প্রবোধ বা ধর্ম-সাক্ষাৎকাররূপ মহৈশ্বর্যবান্ পুত্র লাভ করতে হবে। ঐ প্রবোধরূপ পুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করতে হবে, তা হলেই সে মস্ত একটা বীর হয়ে দাঁড়াবে।

ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা বিনা চেষ্টায় মানুষের সমুদয় ইচ্ছাপক্তি একমুখী হয়ে পড়ে—স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই এর দৃষ্টান্ত। ভক্তিমাগ্ন স্বাভাবিক পথ এবং তাতে যেতেও বেশ আরাম। জ্ঞানমাগ্ন কি

রকম?—না, যেন একটা প্রবল বেগশালিনী পার্বত্য নদীকে জোর করে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে যাওয়া। এতে অতি সস্তর বস্তু লাভ হয় বটে, কিন্তু বড় কঠিন। জ্ঞানমার্গ বলে, “সমুদয় প্রকৃতিকে নিরোধ কর।” ভক্তিমার্গ বলে, “শ্রোতে গা ভাসান দাও, চিরদিনের জন্ত সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর।” এ পথ দীর্ঘ বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর।

ভক্ত বলেন—“প্রভু, চিরকালের জন্ত আমি তোমার। এখন থেকে আমি যা কিছু করছি বলে মনে করি, তা বাস্তবিক তুমিই করছ—আর ‘আমি’ বা ‘আমার’ বলে কিছু নেই।”

“হে প্রভো, আমার অর্থ নেই যে, আমি দান করব; আমার বুদ্ধি নেই যে, আমি শাস্ত্রশিক্ষা করব; আমার সময় নেই যে যোগ অভ্যাস করব; হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে আমার দেহমন অর্পণ করলাম।”

যতই অজ্ঞান বা ভ্রান্ত ধারণা আসুক, কিছুতেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ব্যবধান ঘটাতে পারে না। ঈশ্বর বলে কেউ যদি না থাকেন, তথাপি প্রেমের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক। কুকুরের মত পচা-মড়া খুঁজে খুঁজে মরার চেয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে করতে মরা ভাল। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বেছে নাও, আর সেই আদর্শকে লাভ করবার জন্ত সারা জীবন নিয়োজিত কর। মৃত্যু যখন এত নিশ্চিত, তখন একটা মহান উদ্দেশ্যের জন্ত জীবনপাত করার চেয়ে আর বড় জিনিস কিছু নেই—“সন্নিঘন্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।”

ভক্তিদ্বারা বিনা আয়াসে জ্ঞানলাভ হয়—ঐ জ্ঞানের পর পরাভক্তি আসে।

জ্ঞানী বড় সূক্ষ্ম বিচার করতে ভালবাসে, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয় ; কিন্তু ভক্ত বলে, “ঈশ্বর তাঁর ষথার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করবেন” ; তাই সে সব মানে।

রাবিয়া

রাবিয়া রোগেতে হয়ে মুহম্মান
 নিজ শয্যা পরে আছিল শয়ান।
 এহেন কালেতে নিকটে তাঁহার
 আগমন হল দুই মহাত্মার ;—
 পবিত্র মালিক, জ্ঞানী সে হাসান,
 পূজেন যাদের সব মুসলমান।
 কহিল হাসান সম্বোধিয়া তাঁরে,
 “পবিত্র ভাবেতে প্রার্থনা যে করে,
 যে শাস্তি ঈশ্বর দিউন তাহারে,
 সহিষ্ণুতা-বলে বহন সে করে।”
 পবিত্র মালিক—গভীরাত্মা যিনি,
 বলিলেন নিজ অকুভব-বাণী,
 “প্রভুর যা ইচ্ছা, তাই প্রিয় যার,
 আনন্দ হইবে শাস্তিতে তাহার।”
 রাবিয়া শুনিয়া ছুঁক সাধুবানী,

স্বার্থগন্ধলেশ আছে তাহে গনি ;
 কহিলা, "হে ঈশ, কৃপার ভাজন,
 হুঁহু প্রতি এক করি নিবেদন—
 যে জন দেখেছে প্রভুর বদন,
 আনন্দ-পাথারে হইবে মগন ।
 প্রার্থনার কালে মনেতে তাহার
 উঠিবে না কভু এমত বিচার—
 শাস্তি পাইয়াছি আমি কোনকালে ;
 জানিবে না কভু শাস্তি কারে বলে ।"

—পারসী কবিতা

১২ জুলাই, শুক্রবার

(অগ্নি বেদাস্ত্রস্ত্রের শাক্তরত্নাষ্য হইতে পড়া হইতে লাগিল ।)

'তৎ তু সমন্বয়াৎ'

—বাসস্তুত্র, ১,১,৪ ।

আত্মা বা ব্রহ্মই সমুদয় বেদান্তের প্রতিপাদ্য ।

ঈশ্বরকে বেদান্ত থেকে জানতে হবে । সমুদয় বেদই জগৎ-
 কারণ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা ঈশ্বরের কথা বলছে । সমুদয় হিন্দু
 দেবদেবীর উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় রয়েছে । ঈশ্বর
 এই তিনের একীভাব ।

বেদ তোমাকে ব্রহ্ম দেখিয়ে দিতে পারে না । তুমি ত সেই
 ব্রহ্মই রয়েছ । বেদ করতে পারে এইটুকু যে, যে আবরণটা
 আমাদের চোখের সামনে থেকে সত্যকে আড়াল করে রেখেছে,
 সেইটেই দূর করতে সাহায্য করতে পারে । প্রথম চলে যাক

অজ্ঞানাবরণ, তারপর যার পাপ, তারপর বাসনা ও স্বার্থপরতা দূর হয়,—সুতরাং সব দুঃখ-কষ্টের অবদান হয়। এই অজ্ঞানের তিরোভাব তখনই হতে পারে, যখন আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্ম আর আমি এক; অর্থাৎ আপনাকে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখ, মানবীয় উপাধিগুলোর সঙ্গে নয়। দেহাশ্রবুদ্ধি দূর করে দাঁও দেখি, তা হলেই সব দুঃখ দূর হবে। মনের জোরে রোগ ভাল করে দেওয়ার এই রহস্য। এই জগৎটা একটা সন্মোহনের (Hypnotism) ব্যাপার; নিজের ওপর থেকে এই সন্মোহনের আবেশটা দূর করে ফেল, তা হলেই তোমার আর কষ্ট থাকবে না।

মুক্ত হতে গেলে প্রথমে পাপ ত্যাগ করে পুণ্য উপার্জন করতে হবে, তারপর পাপপুণ্য উভয়ই ত্যাগ করতে হবে। প্রথমে রজঃ দ্বারা তমঃকে জয় করতে হবে, পরে উভয়কেই সত্ত্বগুণে লয় করতে হবে—সর্বশেষে এই তিন গুণকেই অতিক্রম করতে হবে। এমন একটা অবস্থা লাভ কর, যেখানে তোমার প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাস তাঁর উপাসনাস্বরূপ হবে। যখনই দেখ যে, অপরের কথা থেকে কোন জিনিস শিখ্ছ, জেনো যে পূর্বজন্মে তোমার সেই বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছিল; কারণ, অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক।

যতই ক্ষমতা লাভ হবে, ততই দুঃখ বেড়ে যাবে, সুতরাং বাসনাকে একেবারে নাশ করে ফেল। কোন বাসনা করা যেন ভীমরুলের চাকে কাটি দেওয়া। আর বাসনাগুলো সোনার পাত-মোড়া বিষের বড়ি—এইটে জানার নামই বৈরাগ্য।

‘মন ব্রহ্ম নর।’ ‘তত্ত্বমসি’—তুমিই সেই, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’—
আমিই ব্রহ্ম। যখন মানুষ এইটে উপলব্ধি করে, তখন “ভিগ্নতে
হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্তস্তে সর্বসংশয়াঃ”—তার সব হৃদয়গ্রন্থি কেটে যায়, সব
সংশয় ছিন্ন হয়। যতদিন আমাদের উপরে কেউ, এমন কি ঈশ্বর
পর্যন্ত থাকবেন, ততদিন অভয় অবস্থা লাভ হতে পারে না।
আমাদের সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হয়ে যেতে হবে। যদি এমন কোন বস্তু
থাকে যা ব্রহ্ম থেকে পৃথক তা চিরকালই পৃথক থাকবে; তুমি যদি
স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে পৃথক হও, তুমি কখনও তাঁর সঙ্গে এক হতে
পারবে না; আবার বিপরীত ক্রমে, যদি তুমি এক হও, তা হলে
কখনই পৃথক থাকতে পার না। যদি পুণ্যবলেই তোমার
ব্রহ্মের সহিত যোগ হয়, তা হলে পুণ্যক্ষয়েই বিচ্ছেদ আসবে।
আসল কথা, ব্রহ্মের সহিত তোমার নিত্য যোগ রয়েছে—পুণ্য কৰ্ম
কেবল আবরণটা দূর করবার সহায়তা করে। আমরা আজাদ
অর্থাৎ মুক্ত, আমাদের এইটে উপলব্ধি করতে হবে।

‘যমেবৈষ বৃণতে’—যাঁকে এই আত্মা বরণ করেন* এর
তাৎপর্য—আমরাই আত্মা এবং আমরাই নিজেদের বরণ করি।

* নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা বিবৃণতে তনুং স্বাম্।

(কঠ উপ, ১, ২, ২৩)

এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র
শ্রবণেও উহা লাভ হয় না। এই আত্মা যাকে বরণ (অর্থাৎ মনোনীত) করেন
তিনি তাঁকে লাভ করেন; তাঁর নিকটেই এই আত্মা নিজ রূপ প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মদর্শন কি আমাদের নিজেদের চেষ্টা ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করছে, অথবা বাইরের কারণ সাহায্যের উপর নির্ভর করছে?—আমাদের নিজেদের চেষ্টার উপর এটা নির্ভর করছে। আমাদের চেষ্টার দ্বারা আশির উপর যে ময়লা পড়ে রয়েছে, সেইটে অপসারিত হয়—আশি যেমন তেমনি থাকে। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এ তিনের বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। যিনি জানেন যে, তিনি জানেন না, তিনিই ঠিক ঠিক জানেন।* যিনি কেবল একটা মত অবলম্বন করে বসে আছেন, তিনি কিছুই জানেন না।

আমরা বন্ধ, এই ধারণাটাই ভুল।

ধর্ম জিনিসটা এ জগতের নয়; ধর্ম হচ্ছে চিত্তশুদ্ধির ব্যাপার; এই জগতের উপর এর প্রভাব গৌণ মাত্র। মুক্তি জিনিসটা আত্মার স্বরূপ হতে অভিন্ন। আত্মা সदा শুদ্ধ, সदा পূর্ণ, সदा অপরিণামী। এই আত্মাকে তুমি কখনও জানতে পার না। আমরা এই আত্মার সম্বন্ধে 'নেতি নেতি' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না। শঙ্কর বলেন, “যাকে আমরা মন বা কল্পনার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেও দূর করতে পারি না, তাই ব্রহ্ম।”

* * * * *

এই জগৎপ্রপঞ্চ ভাবমাত্র, আর বেদ এই ভাবপ্রকাশক শব্দরাশি মাত্র। আমরা ইচ্ছামত এই জগৎপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি করতে

* 'যশ্চামতং তশ্চ মতং মতং যশ্চ ন বেদ সং।

অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্ ॥ (কেন উপ, ২,৩)

পারি, আবার নাশ করতে পারি। এক সম্প্রদায়ের কন্যীদের মত এই যে, শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে তার অব্যক্ত ভাবটি জাগরিত হয়, আর ফলস্বরূপ একটি ব্যক্ত কার্য উৎপন্ন হয়। তাঁরা বলেন, আমরা প্রত্যেকেই এক একজন সৃষ্টিকর্তা। শব্দবিশেষ উচ্চারণ করলেই তৎসংশ্লিষ্ট ভাবটি উৎপন্ন হবে, আর তার ফল দেখা যাবে। মীমাংসকসম্প্রদায় বলেন, “ভাব হচ্ছে শব্দের শক্তি, আর শব্দ হচ্ছে ভাবের অভিব্যক্তি।”

১৩ই জুলাই, শনিবার

আমরা যা কিছু জানি তাই মিশ্রণস্বরূপ, আর আমাদের সমুদয় বিষয়ানুভূতি বিশ্লেষণ হতে এসে থাকে। মনকে অমিশ্র, স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বস্তু ভাবাই দ্বৈতবাদ। শাস্ত্র বা বই পড়ে দার্শনিক জ্ঞান যা তত্ত্বজ্ঞান হয় না। বরং যত বই পড়বে ততই মন গুলিয়ে যাবে। যে সব দার্শনিক তত চিন্তাশীল নন, তাঁরা ভাবতেন, মনটা একটা অমিশ্র বস্তু—আর তাই থেকে তাঁরা “স্বাধীন ইচ্ছা” নামক মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র (Psychology) মনের অবস্থাসমূহের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে, মন একটা মিশ্রবস্তু; আর যেহেতু প্রত্যেক মিশ্রবস্তু কোন না কোন বাহ্য শক্তিবলে বিধৃত থাকে, সেই হেতু মন বা ইচ্ছাও বহিঃস্থ শক্তিসমূহের সংযোগে বিধৃত রয়েছে। এমন কি, যতক্ষণ না মানুষের ক্ষুধা পাচ্ছে, ততক্ষণ সে খাবার ইচ্ছা করতেও পারে না। ইচ্ছা বা সঙ্কল্প (Will) বাসনার

(Desire) অধীন । কিন্তু তবুও আমরা স্বাধীন বা মুক্তস্বভাব—
সকলেই এটা অনুভব করে থাকে ।

অজ্ঞেয়বাদী বলেন, এই ধারণাটা ভ্রমমাত্র । তা হলে জগতের
অস্তিত্বের প্রমাণ কিরূপে হবে ? এর এই মাত্র প্রমাণ যে, আমরা
সকলেই জগৎ দেখছি ও তার অস্তিত্ব অনুভব করছি । তা হলে
আমরা যে সকলে নিজে নিজে মুক্তস্বভাব বলে অনুভব করছি,
এ অনুভবও যথার্থ না হবে কেন ? যদি সকলে অনুভব করছে
বলে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, তবে সকলেই যখন
আপনাদের মুক্তস্বভাব বা স্বাধীনপ্রকৃতি বলে অনুভব করছে,
তখন তারও অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় । তবে ইচ্ছাটাকে আমরা
যেমন দেখছি তার সম্বন্ধে 'স্বাধীন' কথাটা প্রয়োগ করা চলে না ।
মানুষের নিজ মুক্তস্বভাব সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক বিশ্বাসই সমুদয়
তর্কযুক্তিবিচারের ভিত্তি । 'ইচ্ছা' বন্ধভাবাপন্ন হবার আগে যে রূপ
ছিল, তাই মুক্তস্বভাব । এই যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা—
এতেই প্রতিমূহর্তে দেখাচ্ছে যে, মানুষ বন্ধন কাটাবার চেষ্টা
করছে । একমাত্র বস্তু প্রকৃত মুক্তস্বভাব হতে পারে—তা অনন্ত,
অসীম, দেশকালনিমিত্তের বাইরে । মানুষের ভিতর এক্ষণে যে
স্বাধীনতা রয়েছে, সেটা একটা পূর্বস্বতিমাত্র, স্বাধীনতা বা
মুক্তিলাভের চেষ্টামাত্র ।

জগতে সকল জিনিস যেন ঘুরে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা
করছে,—তার উৎপত্তিস্থানে যাবার, তার একমাত্র যথার্থ উৎপত্তি-
স্থান আত্মার কাছে যাবার চেষ্টা করছে । মানুষ যে স্থখের
অন্বেষণ করছে, সেটা আর কিছু নয়— সে যে সাম্যভাব হারিয়েছে,

সেইটে পুনরায় পাকার চেষ্টা করছে। এই যে নীতিপালন, এও বন্ধভাবাপন্ন ইচ্ছার মুক্ত হবার চেষ্টা, আর এই হতেই প্রমাণ হয় যে আমরা পূর্ণাবস্থা থেকে নেমে এসেছি।

* * * * *

কর্তব্যের ধারণাটা যেন দুঃখরূপ মধ্যাহ্ন-মার্ভণ্ড—আত্মাকে যেন দগ্ধ করে ফেলেছে। “হে রাজন, এই এক বিন্দু অমৃত পান করে সুখী হও।” (আত্মা অকর্তা, এই ধারণাই অমৃত।)

কার্য্য চলুক, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যেন না আসে; কার্য্যোতে সুখই হয়ে থাকে, সমুদয় দুঃখ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ফল। শিশু আগুনে হাত দেয়—তার সুখ হয় বলেই; কিন্তু যখনই তার শরীর প্রতিক্রিয়া করে তখনই পুড়ে যাওয়ার কষ্ট বোধ হয়ে থাকে। ঐ প্রতিক্রিয়াটা বন্ধ করতে পারলে আমাদের আর ভয়ের কারণ কিছু নেই। মস্তিষ্ককে নিজের বশে নিয়ে এস, যেন সে প্রতিক্রিয়াটার খবর না রাখতে পারে। সাক্ষী স্বরূপ হও, দেখো যেন প্রতিক্রিয়া না আসে, কেবল তা হলেই তুমি সুখী হতে পারবে। আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখকর মুহূর্ত সেইগুলি, যে সময় আমরা নিজেদের একেবারে ভুলে যাই। স্বাধীনভাবে প্রাণ খুলে কাজ কর, কর্তব্যের ভাব থেকে কাজ করো না। আমাদের কোনই কর্তব্য নেই। এই জগৎটা ত একটা খেলার আখড়া—আমরা এখানে খেলছি; আমাদের জীবন ত অনন্ত আনন্দাবকাশ।

জীবনের সমগ্র রহস্য হচ্ছে নির্ভীক হওয়া। তোমার কি হবে, এ ভয় কখনও করো না, কারও উপর নির্ভর করো না। যখন

তুমি অপরের সাহায্যের আশা ভরসা ছেড়ে দাও, কেবল সেই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। যে স্পঞ্জটা পুরা জল শুষে নিয়েছে, সে আর জল টানতে পারে না।

* * * * *

আত্মরক্ষার জন্যও লড়াই করা অন্তায়, যদিও গায়ে পড়ে অপরকে আক্রমণ করার চেয়ে সেটা উচু জিনিস। 'খ্যাঘা ক্রোধ' বলে কোন জিনিস নেই; কারণ, সকল বস্তুতে সমস্ত বুদ্ধির অভাব থেকেই ক্রোধ এসে থাকে।

১৪ই জুলাই, রবিবার

ভারতের দর্শন শাস্ত্রের অর্থ হচ্ছে—যে শাস্ত্র বা যে বিদ্যা দ্বারা আমরা ঈশ্বরসাক্ষাৎকার করতে পারি। দর্শন হচ্ছে ধর্মের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং কোন হিন্দু কখনও ধর্ম ও দর্শনের ভিতর সংযোগসূত্র কি, তা জানতে চাবে না।

দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর তিনটি সোপান আছে :—১ম, স্থূল বস্তুসমূহের পৃথক পৃথক জ্ঞান (Concrete); ২য়, ঐগুলিকে এক এক শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করা বা তাদের মধ্যে সামান্য আবিষ্কার করা (Generalised); ৩য়, সেই সামান্যগুলির ভিতর আবার সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ঐক্য আবিষ্কার করা (Abstract)। সমুদয় বস্তু যেখানে একত্র প্রাপ্ত হয়, সেই চূড়ান্ত বস্তু হচ্ছেন অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। ধর্মের প্রথমাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বা রূপবিশেষের সহায়তা গৃহীত হয়ে থাকে দেখা যায়; দ্বিতীয় অবস্থায় নানাবিধ পৌরাণিক বর্ণনা ও উপদেশের বাহুল্য; সর্বশেষ অবস্থায় দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিবৃতি। এদের মধ্যে প্রথম দুটি শুধু সাময়িক

প্রয়োজনের জন্ত, কিন্তু দর্শনই ঐ সকলের মূল ভিত্তিস্বরূপ, আর
অন্যগুলি সেই চরমতত্ত্বে পৌঁছবার সোপানস্বরূপমাত্র।

পাশ্চাত্য দেশে ধর্মের ধারণা এই, বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্ট
ও খৃষ্ট ব্যতীত ধর্মই হতে পারে না। যাহুদীধর্মো ও মুশা ও
প্রফেটদের সহক্বে এই রকম এক ধারণা আছে। একরূপ ধারণার
হেতু এই যে, এই সব ধর্ম কেবল পৌরাণিক বর্ণনার উপর নির্ভর
করে। প্রকৃত সর্বোচ্চ ধর্ম যা, তা এই সকল পৌরাণিক বর্ণনা
ছাড়িয়ে ওঠে; সে ধর্ম কখনও শুধু এদেরই উপর নির্ভর করতে
পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তবিকই ধর্মের ভিত্তিকে আরও
দৃঢ় করেছে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডটা যে এক অখণ্ড বস্তু, তা বিজ্ঞানের
দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে। দার্শনিক যাকে সত্য বলেন,
বৈজ্ঞানিক তাকেই জড় বলে থাকেন; কিন্তু ঠিক ঠিক দেখতে
গেলে, এদের দুজনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ, দুই-ই
এক জিনিস। 'দেখ না, পরমাণু অদৃশ্য ও অচিন্ত্য, অথচ তাতে
ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে। বেদান্তীরাও আত্মা
সহক্বে ঠিক এই ভাবের কথাই বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সব
সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাষায় ঐ এক কথাই বলছেন।

বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়ই জগতের কারণস্বরূপ
এমন এক বস্তুকে নির্দেশ করছেন যা হতে অন্য কিছুই সাহায্য
ব্যতীত জগতের প্রকাশ হয়েছে। সেই এক কারণই নিমিত্ত, এক
সমবায়ী ও অসমবায়ী উপাদান-কারণ সবই। যেমন কুস্তকার
যুত্তিকা থেকে ঘট নির্মাণ করছে; এখানে কুস্তকার হচ্ছে নিমিত্ত-
কারণ, যুত্তিকা হচ্ছে সমবায়ী উপাদান-কারণ, আর কুস্তকারের

চক্র অসমবায়ী উপাদান-কারণ। কিন্তু আত্মা এই তিনই। আত্মা কারণও বটেন, এবং অভিব্যক্তি বা কার্যও বটেন। বেদান্তী বলেন, এই জগৎটা সত্য নয়, এটা আপাতপ্রতীয়মান সত্তামাত্র। প্রকৃতি আর কিছুই নয়, অবিজ্ঞাবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ব্রহ্মমাত্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর প্রকৃতি বা এই জগৎপ্রপঞ্চ হয়েছেন; অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর এই জগৎ-প্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন বটে, কিন্তু তিনি জগৎ নন।

আমরা অমুভূতি বিশেষকে একটা মানসিক প্রক্রিয়ারূপেই জানতে পারি—একে মানসিক একটি ঘটনারূপে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে একটা দাগরূপে জানতে পারি। আমরা মস্তিষ্ককে সন্মুখে বা পশ্চাতে চালাতে পারি না, কিন্তু মনকে পারি। মনকে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সমুদয় কালেই প্রসারিত করা যেতে পারে। স্মৃতির মনে মনে যা যা ঘটে, তা অনন্তকালের জগৎ সঞ্চিত থাকে। মনের মধ্যে সব ঘটনা পূর্বে থেকেই সংস্কারের আকারে রয়েছে; মন সর্বব্যাপী কি না।

দেশকালনিমিত্ত যে চিন্তারই প্রণালীবিশেষ—এই আবিষ্কারই ক্যান্টের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। কিন্তু বেদান্ত বহু পূর্বে এই কথা শিখিয়ে গেছে, আর একে মায়ী নামে অভিহিত করেছে। সোপেনহাওয়ার কেবল যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে বেদান্ত তত্ত্বগুলি যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। শঙ্কর বেদকে আর্ষ বলে গেছেন।

• • • • •
অনেকগুলি বৃক্ষ দেখে তাদের যে সাধারণ ধর্ম বৃক্ষত্ব—তার

আবিষ্কারের নামই জ্ঞান। আর সর্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে সেই এক
বস্তুর জ্ঞান।...

সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চের চরম সামান্য বা সাধারণ ভাবই মঙ্গল
ঈশ্বর ; কেবল সেটা অস্পষ্ট, এবং সুনির্দিষ্ট ও দার্শনিক বিচারসম্মত
নয়।...

সেই এক তত্ত্ব স্বয়ং অভিব্যক্ত হচ্ছে, তা থেকেই যা কিছু সব
হয়েছে।...

পদার্থবিজ্ঞানের কার্য্য ঘটনাবলীর আবিষ্কার, আর দর্শন যেন
ঐ বিভিন্ন ঘটনারূপ ফুলগুলো নিয়ে তোড়া বাঁধবার সূতো।
চিন্তাসহায়ে ঐক্য আবিষ্কারের চেষ্টামাত্রই দর্শনের এলাকায়।
এমন কি, একটা গাছের গোড়ায় সার দেওয়ার ব্যাপারটাতেও
এইরূপ একটা ঐক্যাবিস্কারপ্রণালীর (Process of Abstrac-
tion) সহায়তা নিতে হয়।...

ধর্মের ভিতর স্থূল, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম তত্ত্ব, ও চরম একত্ব—এই
তিন ভাবই আছে। কেবল স্থূল বা বিশেষ নিয়েই পড়ে থেকো
না। সেই চরম সূক্ষ্ম তত্ত্বে, সেই একত্বে চলে যাও।

* * * *

অসুরেরা তমঃপ্রধান যন্ত্র, দেবতারাই সত্ত্বপ্রধান যন্ত্র ; কিন্তু
দুই-ই যন্ত্র। মানুষই কেবল যন্ত্রবৎ নয়। যন্ত্রবৎ ভাবটাকে দূর
করে দাও ; দেব অসুর, দুই হতেই তুমি শ্রেষ্ঠ—এইটে ধারণা
কর, তবেই তুমি মুক্ত হতে পারবে। এই পৃথিবীই একমাত্র
স্থান, যেখানে মানুষ নিজের মুক্তি সাধন করতে পারে।

‘যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ’—এই আত্মা যাকে বরণ করেন,

এ কথাটা সত্য। বরণ বা মনোনীত করাটা সত্য, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে এর অর্থ করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ বরণ করছে, কথাটার যদি এইরূপ অদৃষ্টবাদমূলক ব্যাখ্যা করা যায়, তবে ত এটা ভয়ানক কথা হয়ে দাঁড়ায়।

১৫ই জুলাই, সোমবার

যেখানে স্ত্রীলোকদের বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, যেমন তিব্বতে, তথায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের চেয়ে অধিক বলবান্ হয়ে থাকে। যখন ইংরেজেরা ঐ দেশে যায়, এই স্ত্রীলোকেরা জোয়ান জোয়ান পুরুষদের ঘাড়ে নিয়ে পাহাড় চড়াই করে।

মালাবার দেশে অবশ্য স্ত্রীলোকদের বহুবিবাহ নাই, কিন্তু তথায় সব বিষয়ে স্ত্রীলোকদের প্রাধান্য। তথায় সর্বত্রই বিশেষভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার দিকে নজর দেখা যায়, আর বিজ্ঞাচর্চায় যার পর নাই উৎসাহ। আমি যখন ঐ দেশে গিয়েছিলাম, আমি অনেক স্ত্রীলোক দেখেছিলাম, যারা উত্তম সংস্কৃত বলতে পারে, কিন্তু ভারতের অত্র দশ লক্ষের মধ্যে একজনও পারে কি না, সন্দেহ। স্বাধীনতায় উন্নতি হয়, কিন্তু দাসত্ব থেকে অবনতিই হয়ে থাকে। পর্তুগীজ বা মুসলমানেরা কখন মালাবার জয় করেনি।

দ্রাবিড়ীরা মধ্য-এশিয়ার এক অনার্য্যজাতি—আর্য্যদের পূর্বেই তারা ভারতে এসেছিল, আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীরাই সব চেয়ে সভ্য ছিল। তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর

সামাজিক অবস্থা উন্নত ছিল। পরে তারা ভাগ হয়ে গেল ; কতকগুলি মিশরে কতকগুলি বাবিলোনিয়ায় চলে গেল, অবশিষ্ট ভাগ ভারতেই রইল।

১৬ই জুলাই, মঙ্গলবার। (শঙ্কর)

অদৃষ্ট (অর্থাৎ অব্যক্ত কারণ বা সংস্কার) আমাদের কাছে যাগযজ্ঞ উপাসনাদি করায়, তা থেকে ব্যক্ত ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মুক্তিলাভ করতে হলে আমাদের কাছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তারপর নিদিধ্যাসন করতে হবে।

কর্মের ফল আর জ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ পৃথক্। Morality বা বৈধী ধর্মের মূল হচ্ছে—“এই কাজ করো” এবং “এই কাজ করো না”; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের দেহ মনের সঙ্গেই সম্বন্ধ। এদের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; সুতরাং সুখদুঃখ ভোগ করতে গেলেই শরীরের প্রয়োজন। যার দেহ যত শ্রেষ্ঠ হবে, তার ধর্ম বা পুণ্যের আদর্শও তত উচ্চতর হবে; এই রকম ব্রহ্মার পর্য্যন্ত। কিন্তু সকলেরই শরীর আছে। আর যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ সুখদুঃখ থাকবেই; কেবল মহাতীত বা বিদেহ হলেই সুখদুঃখকে একেবারে অতিক্রম করা যেতে পারে। শঙ্কর বলেন, আত্মা বিদেহ।

কোন বিধিনিষেধের দ্বারা মুক্তিলাভ হতে পারে না। তুমি সন্ন্যাসী মুক্তই আছ। যদি তুমি পূর্বে হতেই মুক্ত না থাক, কিছুই তোমার মুক্তি দিতে পারে না। আত্মা স্বপ্রকাশ। কার্যকারণ

আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না—এই বিদেহ অবস্থার নামই মুক্তি। ব্রহ্ম ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সমুদরের পারে। যদি মুক্তি কোন কর্মের ফলস্বরূপ হত, তবে তার কোন মূল্যই থাকত না, সেটা একটা যৌগিক বস্তু হত, সুতরাং তার ভিতর বন্ধনের বীজ নিহিত থাকত। এই মুক্তিই আত্মার একমাত্র নিত্যসঙ্গী, তাকে লাভ করতে হয় না, সেটা আত্মার স্বার্থ স্বরূপ।

তবে আত্মার উপর যে আবরণ পড়ে রয়েছে, সেইটে সরাবার জন্ত—বন্ধন ও ভ্রম দূর করবার জন্ত—কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজন ; এরা মুক্তি দিতে পারে না বটে, কিন্তু তথাপি আমরা যদি নিজেরা চেষ্টা না করি, তা হলে আমাদের চোখ ফোটে না, আমরা আমাদের স্বরূপ জানতে পারি না। শঙ্কর আরও বলেন, অদ্বৈতবাদই বেদের গৌরবমুকুটস্বরূপ ; কিন্তু বেদের নিম্নভাগ-গুলিরও প্রয়োজন আছে, কারণ, তারা আমাদের কর্ম ও উপাসনার উপদেশ দিয়ে থাকে, আর এইগুলির সহায়তায়ও অনেকে ভগবানের কাছে গিয়ে থাকে। তবে এমন অনেকে থাকতে পারে, যারা কেবল অদ্বৈতবাদের সাহায্যেই সেই অবস্থায় যাবে। অদ্বৈতবাদ যে অবস্থায় নিয়ে যায়, কর্ম ও উপাসনাও সেই অবস্থাতেই নিয়ে যায়।

শাস্ত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, কেবল অজ্ঞান দূর করে দিতে পারে। তাদের কার্য্য নাশাত্মক (negative)। শঙ্করের প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি শাস্ত্রও মেনেছিলেন, অখচ সকলের সামনে মুক্তির পথও খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যাই বল, তাঁকে ঐ নিয়ে চুলচেরা বিচার করতে হয়েছে ; প্রথমে

মানুষকে একটা স্থূল অবলম্বন দাও, তার পর ধীরে ধীরে তাকে সর্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাও। বিভিন্ন প্রকার ধর্ম এই চেষ্টাই করছে, আর এ থেকে বুঝা যায়—কেন ঐ সকল ধর্ম জগতে এখনও রয়েছে এবং কি করে প্রত্যেকটিই মানুষের উন্নতির কোন না কোন অবস্থায় উপযোগী। শাস্ত্র যে অবিद्या দূর করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, সে নিজেই যে সেই অবিद्याর অন্তর্গত। শাস্ত্রের কার্য হচ্ছে জ্ঞানের উপর যে অজ্ঞানরূপ আবরণ এসে পড়েছে, তাকে দূর করা। “সত্য অসত্যকে দূর করে দেবে।” তুমি মুক্তই আছ, তোমাকে আবার কিসে মুক্ত করে দেবে? যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ধর্মমতবিশেষ অবলম্বন করে আছ, ততক্ষণ তুমি ব্রহ্মকে লাভ করনি। “যিনি মনে করেন, আমি জানি, তিনি জানেন না।” যিনি স্বয়ং জ্ঞাতাস্বরূপ, তাঁকে কে জানতে পারে? দুটি বস্তু আছে—ব্রহ্ম ও জগৎ। তন্মধ্যে ব্রহ্ম অপরিণামী, জগৎ পরিণামী। জগৎ অনন্তকাল ধরে রয়েছে। তোমরা ত অনন্ত তাকেই বলে থাক, যেখানে কতখানি পরিণাম হচ্ছে, মন তা ধরতে পারে না।

* জগৎ ও ব্রহ্ম এক বটে, কিন্তু এক সময়ে ত তোমরা দুটো দেখতে পাও না—একখানা পাথরের উপর একটা ছবি খোদাই করা হয়েছে—যখন তোমার পাথরের দিকে খেয়াল থাকে, তখন খোদাইএর দিকে থাকে না, আবার যখন খোদাইএর দিকে খেয়াল দাও, তখন পাথরের খেয়াল থাকে না।

* * * *

তুমি কি এক মুহূর্তের জগুই আপনাকে সম্পূর্ণ স্থির করতে পার? সকল যোগীই বলেন, এটা করা সম্ভব।

* * * *

সকলের চেয়ে বেশী পাপ হচ্ছে, নিজেকে দুর্বল ভাবা। তোমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই; উপলব্ধি কর যে, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। যে কোন বস্তুতে তুমি শক্তির বিকাশ দেখ, সে শক্তি তোমারই দেওয়া।

আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, এমন কি, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের উপরে। শিক্ষা দাও যে, মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ। মন বলে কিছু আছে, এটি স্বীকার করো না, বা নেই তাকে আর নূতন করে সৃষ্টি করো না। সদর্পে বল, আমি প্রভু, আমি সকলের প্রভু। আমরাই নিজের নিজের শৃঙ্খল গড়েছি, আর আমরাই কেবল ঐ শিকল ভাঙতে পারি।

কোন প্রকার কর্ম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হতে পারে। জ্ঞান অপ্রতিরোধ্যনীয়; ইচ্ছা হল, তাকে গ্রহণ করলাম, ইচ্ছা হল ত্যাগ করলাম—মন একরূপ করতেই পারে না। যখন জ্ঞানোদয় হবে, মনকে তা গ্রহণ করতেই হবে। সুতরাং এই জ্ঞানলাভ মনের কার্য্য নয়। তবে মনে ঐ জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে থাকে বটে।

কর্ম বা উপাসনার ফল এইটুকু যে, ওতে তোমার যে স্বরূপ ভুলেছিলে, তাতে ফের পৌঁছে দেয়। আত্মা যে দেহ, এইটে মনে করাই সম্পূর্ণ ভ্রম; সুতরাং আমরা এই শরীরে থাকতে থাকতেই মুক্ত হতে পারি। দেহের সঙ্গে আত্মার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। মাঝার অর্থ 'কিছু না' নয়, মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা।

১৭ই জুলাই, বুধবার

রামানুজ জগৎপ্রপঞ্চকে চিং (জীবাশ্ম বা সাধারণ জ্ঞানভূমি), অচিং (জড় প্রকৃতি বা জ্ঞানের অধোভূমি), এবং ঈশ্বর (জ্ঞানা-তীত ভূমি বা তুরীয় ভূমি)—এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। শঙ্কর কিন্তু বলেন, চিং বা জীবাশ্ম, এবং পরমাশ্ম বা ঈশ্বর এক বস্তু। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ; ঐ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত তাঁর গুণ নয়। ঈশ্বরকে চিন্তা করতে গেলেই তাঁকে বিশিষ্ট করা হয়; তাঁর সম্বন্ধে বড় জোর 'ওঁ তৎসৎ', অর্থাৎ তিনি সত্তা-স্বরূপ, তিনি অস্তিত্বস্বরূপ, এই মাত্র বলা যেতে পারে।

শঙ্কর আরও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সত্তাকে আর সব বস্তু হতে পৃথক্ করে দেখতে পার? দুটি বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোন্‌ খানে? ইন্দ্রিয়জ্ঞানে নয়, কারণ, তা হলে সব জিনিসই এক রকম বোধ হত। আমাদের বিষয়জ্ঞান একটার পর আর একটা, এই ক্রমে হয়ে থাকে। একটা বস্তু কি তা জানতে গেলেই, সঙ্গে সঙ্গে সেটা কি নয়, তাও তোমাদের জানতে হয়। দুটি বস্তুর মধ্যে পার্থক্যগুলি আমাদের স্মৃতির মধ্যেই অবস্থিত, আর মস্তিষ্কে যা সঞ্চিত রয়েছে, তারই সঙ্গে তুলনা করে আমরা এগুলি জানতে পারি। ভেদ, বস্তুর স্বরূপের মধ্যে নেই, সেটা আমাদের মস্তিষ্কে রয়েছে। বাইরে এক অনন্ত বস্তুই রয়েছে, ভেদ কেবল ভেতরে, আমাদের মনে, স্মৃতির বহুজ্ঞান মনেরই সৃষ্টি।

এই বিশেষগুলিই গুণপদবাচ্য হয়, যখন তারা পৃথক্ থাকে, অথচ কোন একটি জিনিসের সহিত জড়িত থাকে। এই বিশেষ

জিনিসটা কি আমরা ঠিক করে বলতে পারিনে। আমরা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেখতে পাই ও অনুভব করি কেবল সত্তা, অস্তিত্ব। আর যা কিছু, সব আমাদেরই মধ্যে রয়েছে। কোন বস্তুর সত্তা সম্বন্ধেই শুধু আমরা নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়ে থাকি। বিশেষ বা ভেদগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌণভাবে সত্য—যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। কারণ, ঐ সর্পজ্ঞানেরও সত্যতা আছে;—কেননা অযথার্থভাবে হলেও একটা কিছু ত দেখা যাচ্ছে। যখন রজ্জুজ্ঞানের লোপ হয়, তখনই সর্পজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, আবার বিপরীত ক্রমে সর্পজ্ঞানের লোপে রজ্জুজ্ঞানের আবির্ভাব। কিন্তু তুমি একটা মাত্র জিনিস দেখছ বলে প্রমাণ হয় না যে, অণু জিনিসটা নেই। জগৎ-জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে তাকে আবরণ করে রেখেছে, তাকে দূর করতে হবে, কিন্তু ওরও যে অস্তিত্ব আছে, তা স্বীকার করতেই হবে।

শঙ্কর আরও বলেন যে, অনুভূতিই (Perception) অস্তিত্বের চরম প্রমাণ। অনুভূতি স্বয়ংজ্যোতিঃ ও স্বয়ংপ্রকাশ; কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বাইরে যেতে গেলে আমরা তাকে ছাড়তে পারি না। অনুভূতি কোন ইন্দ্রিয় বা করণসাপেক্ষ নয়, এটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। অনুভূতি সংজ্ঞা (Consciousness) ব্যতীত হতে পারে না; অনুভব স্বপ্রকাশ; তারই আংশিক প্রকাশকে সংজ্ঞা বলে। কোন প্রকার অনুভবক্রিয়াই সংজ্ঞারহিত হতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অনুভূতির স্বরূপই হচ্ছে সংজ্ঞা। সত্তা আর অনুভব এক বস্তু, দুটো পৃথক পৃথক জিনিস এক সঙ্গে জোড়া নয়। আর, যার কোন কারণ নেই, তাই অনন্ত, সুতরাং অনুভূতি যখন

নিজেই নিজের চরম প্রমাণ, তখন অনুভূতিও অনন্তস্বরূপ ;
 এটা সর্বদাই স্বয়ংবেগ ; অনুভূতি স্বয়ংই নিজের জ্ঞাতাস্বরূপ ;
 এটা মনের ধর্ম নয়, কিন্তু তা হতেই মন হয়েছে ; এইটাই
 পূর্ণ ও একমাত্র জ্ঞাতা ; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিই আত্মা ।
 এটা স্বয়ং অনুভবস্বরূপ, কিন্তু সাধারণ অর্থে একে জ্ঞাতা বলা
 যেতে পারে না ; কারণ, তাতে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্তাকে বুঝায় ।
 কিন্তু শঙ্কর বলেন, আত্মা অহং নন, কারণ তাঁতে 'আমি আছি'
 এই ভাবটি নেই । আমরা সেই আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র, আর
 আত্মা ও ব্রহ্ম এক ।

যখনই তুমি সেই পূর্ণব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বল বা ভাব, তখনই
 আপেক্ষিকভাবে সেগুলি করতে হয়, সুতরাং সেখানে এই সকল
 যুক্তিবিচার খাটে । কিন্তু যোগাবস্থায় অনুভূতি ও অপরোক্ষানুভূতি
 এক হয়ে যায় ; রামানুজব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আংশিকভাবে
 একত্বদর্শন ; সুতরাং সেটাও সেই অদ্বৈতাবস্থার এক সোপানস্বরূপ ।
 'বিশিষ্ট' মানেই ভেদযুক্ত । 'প্রকৃতি' মানে জগৎ, আর তার সদা
 পরিণাম হচ্ছে । পরিণামী চিন্তারাশি পরিণামশীল শব্দরাশি দ্বারা
 অভিব্যক্ত হয়ে কখনও সেই পূর্ণস্বরূপকে প্রমাণ করতে পারে না ।
 ঐরূপ করে আমরা শুধু এমন একটা জিনিসে উপনীত হই যা
 থেকে কতকগুলি গুণ বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ
 নয় । আমরা কেবল শব্দগত একত্বে পৌঁছাই, তার চেয়ে আর
 চরম ঐক্য বারু করা যায় না, কিন্তু তাতে আপেক্ষিক জগতের
 বিলোপসাধন হয় না ।

১৮ই জুলাই, বুধসপ্ততিবার

(অঙ্ককার আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ সাংখ্যদর্শনের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্যের যুক্তিগুলি ।)

সাংখ্যেরা বলেন, জ্ঞান একটি মিশ্র পদার্থ, আর তারও পারে, বিশ্লেষণ করতে করতে গিয়ে শেষে আমরা সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব অবগত হই ; এই পুরুষ সংখ্যায় বহু ; আমরা প্রত্যেকেই এক একটি পুরুষ । অদ্বৈতবেদান্ত কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলেন, পুরুষ কেবল একমাত্র হতে পারে ; পুরুষের জ্ঞান, অজ্ঞান বা আর কিছু গুণ বা ধর্ম থাকতে পারে না, কারণ, গুণ থাকলেই সেগুলি তার বন্ধনের কারণ হবে, আর পরিণামে সেগুলির লোপও হবে । অতএব সেই এক বস্তু অবশ্যই সর্বপ্রকার গুণরহিত, এমন কি, জ্ঞান-পর্যন্ত তাতে থাকতে পারে না, আর তা জগৎ বা আর কিছুর কারণ হতে পারে না । বেদ বলেন, “সদেব সৌম্যেন্দমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্”—হে সৌম্য, প্রথমে সেই এক অদ্বিতীয় সংই ছিলেন ।

* * * *

যেখানে সত্ত্বগুণ, সেইখানেই জ্ঞান দেখা যায় বলে এ প্রমাণ হয় না যে সত্ত্বই জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ । বরং মানবের ভিতর জ্ঞান পূর্ব হতেই রয়েছে, সত্ত্বের সান্নিধ্যে সেই জ্ঞান প্রকাশ হয় মাত্র । যেমন আগুনের কাছে একটা লৌহগোলক রাখলে ঐ আগুন লৌহগোলকটার ভিতর পূর্ব হতেই যে তেজ অব্যক্তভাবে ছিল, তাকেই প্রকাশ করে গোলকটাকে উত্তপ্ত করে—তার ভিতরে প্রবেশ করে না, সেই রকম ।

শঙ্কর বলেন, জ্ঞান একটা বস্তু নয়, কারণ, এ সেই পুরুষ বা ব্রহ্মের স্বরূপ। জগৎ ব্যক্ত বা অব্যক্তরূপে সর্বদাই রয়েছে, সুতরাং সে জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞেয় বস্তুর কোন কালে অভাব হয় না।

জ্ঞান-বল-ক্রিয়াই ঈশ্বর। জ্ঞানলাভের জন্ত তাঁর দেহেন্দ্রিয়াদি কোন আকারেরই প্রয়োজন নাই—যে সমীম, তার পক্ষে সেই অনন্ত জ্ঞানকে ধরে রাখবার জন্ত একটা প্রতিবন্ধকের (অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির) প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের ঐরূপ সহায়তার আদৌ কোন আবশ্যকতা নেই। বাস্তবিক এক আত্মাই আছেন, বিভিন্ন-লোকগামী জীবাত্মা বলে স্বতন্ত্র আত্মা কিছু নেই। পঞ্চ-প্রাণ যাতে একীভূত হয়েছে, এই দেহের সেই চেতন নিয়ন্তাকেই জীবাত্মা বলে, কিন্তু সেই জীবাত্মাই পরমাত্মা, যেহেতু আত্মাই সব। তুমি তাকে যে অন্তরূপ বোধ করছ, সে ভ্রান্তি তোমারই, জীবে সে ভ্রান্তি নেই। তুমিই ব্রহ্ম, আর তুমি আপনাকে আর যা কিছু বলে ভাবছ, তা ভুল। কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলে পূজা করো না, কৃষ্ণের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন, তাঁরই উপাসনা কর। শুধু আত্মার উপাসনাই মুক্তিলাভ হবে। এমন কি, সগুণ ঈশ্বর পর্য্যন্ত সেই আত্মার বহিঃপ্রকাশমাত্র। শঙ্কর বলেছেন, “স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে—নিজ-স্বরূপের আন্তরিক অনুসন্ধানকেই ভক্তি বলে।

আমরা ঈশ্বরলাভের জন্ত যত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকি, সে সব সত্য। কেবল, যেমন অরুক্ষতী নক্ষত্রকে দেখাতে হলে তার আশপাশের নক্ষত্রগুলার সাহায্য নিতে হয়, এও তেমনি।

* * * *

ভগবদগীতা বেদান্ত সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ।

১৯শে জুলাই, শুক্রবার

যতদিন আমার 'আমি' 'তুমি' এইরূপ ভেদজ্ঞান রয়েছে, ততদিন একজন ভগবান আমাদের রক্ষা করছেন, এ কথা বলবারও আমার অধিকার আছে। যতদিন আমার এইরূপ ভেদবোধ রয়েছে, ততদিন এই ভেদবোধ থেকে যে সকল অনিবার্য সিদ্ধান্ত আসে সেগুলিও নিতে হবে, 'আমি' 'তুমি' স্বীকার করলেই আমাদের আদর্শস্থানীয় আর এক তৃতীয় বস্তু স্বীকার করতে হবে, যা এই দুয়ের মাঝখানে আছে; সেইটাই ঈশ্বর—ত্রিভুজের শীর্ষ-বিন্দুস্বরূপ—যেমন বাষ্প থেকে জল হয়, সেই জল আবার গঙ্গাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ হয়। বাষ্পাবস্থা যখন, তখন আর তাকে গঙ্গা বলা যায় না, আবার জল যখন তখন তাকে বাষ্প বলা যায় না। সৃষ্টি বা পরিণামের ধারণার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির ধারণা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যতদিন পর্যন্ত আমরা জগৎকে গতিশীল দেখছি, ততদিন তার পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার করতে হয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞান যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, পদার্থ বিজ্ঞান তা প্রমাণ করে দেয়; আমরা কোন জিনিসকে যেমন দেখি, শুনি, স্পর্শ, ঘ্রাণ বা আশ্বাদ করি, স্বরূপতঃ জিনিসটা বাস্তবিক তা নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকারের স্পন্দন বিশেষ বিশেষ ফল উৎপাদন করছে, আর সেইগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করছে; আমরা কেবল আপেক্ষিক সত্য জানতে পারি।

'সত্য' শব্দ 'সৎ' থেকে এসেছে। যা 'সৎ' অর্থাৎ যা 'আছে',

যেটি 'অস্তিত্বরূপ' সেইটিই সত্য। আমাদের বর্তমান দৃষ্টি থেকে এই জগৎপ্রপঞ্চ ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির প্রকাশ বলে বোধ হচ্ছে। আমাদের অস্তিত্ব যতটুকু সত্য, সগুণ ঈশ্বরও ততটুকু সত্য, তদপেক্ষা অধিক সত্য নয়। আমাদের রূপ যেমন দেখা যায়, ঈশ্বরকেও তদ্রূপ সাকারভাবে দেখা যেতে পারে। যতদিন আমরা মানুষ রয়েছি, ততদিন আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন; আমরা যখন নিজেরা ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যাব, তখন আর আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকবে না। সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সেই জগজ্জননীকে তাঁর কাছে সদা সর্বদা বর্তমান দেখতেন—তাঁর চতুর্দিকস্থ অগ্ৰাণ্য সকল বস্তু অপেক্ষা তাঁকে সত্য দেখতেন; কিন্তু সমাধি অবস্থায় তাঁর আত্মা ব্যতীত আর কিছুর অনুভব থাকত না। সেই সগুণ ঈশ্বর ক্রমশঃ আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে থাকেন, শেষে তিনি যেন গলে যান, তখন 'ঈশ্বর'ও থাকে না, 'আমি'ও থাকে না—সব সেই আত্মায় লয় হয়ে যায়।

* আমাদের এই জ্ঞান একটা বন্ধনস্বরূপ। সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার কল্পনা রূপ এক মত আছে, তাতে রূপাদি সৃষ্টির পূর্বে বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করে লওয়া হয়। কিন্তু জ্ঞান যদি কিছুর কারণ হয়, তাও আবার অপর কিছুর কার্যস্বরূপ। একেই বলে মায়া। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেন, আবার আমরা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করি—এই হল মায়া। সর্বত্র এইরূপ চক্রগতি দেখা যায়। মন দেহকে সৃষ্টি করছে, আবার দেহ মনকে সৃষ্টি করছে—ডিম থেকে পাখী, আবার পাখী থেকে ডিম; গাছ থেকে বীজ, আবার বীজ থেকে

গাছ। এই জগৎপ্রপঞ্চ সম্পূর্ণ বৈষম্যভাবাপন্ন নয়, আবার সম্পূর্ণ সাম্যভাবাপন্নও নয়। মানুষ স্বাধীন—তাকে এই দুই ভাবের উপরে উঠতে হবে। এ দুটোই নিজ নিজ প্রকাশভূমিতে সত্য বটে, কিন্তু সেই যথার্থ সত্য, সেই অস্তিত্বরূপকে লাভ করতে গেলে আমরা এক্ষণে যা কিছু অস্তিত্ব, ইচ্ছা, জ্ঞান, করা, যাওয়া, জানা বলে জানি, সে সব অতিক্রম করতে হবে। জীবাশ্মার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নেই—ওটা মিশ্র বস্তু বলে কালে খণ্ড খণ্ড হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। যাকে আর কোনরূপে বিশ্লেষণ করা যায় না, কেবল সেই বস্তুই অমিশ্র এবং কেবল সেইটাই সত্যস্বরূপ, মুক্তস্বভাব, অমৃত ও আনন্দস্বরূপ। এই ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করবার জন্ত যত চেষ্টা, সবই বাস্তবিক পাপ—আর ঐ স্বাতন্ত্র্যকে নাশ করবার সমুদয় চেষ্টাই ধর্ম বা পুণ্য। এই জগতে সবই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই স্বাতন্ত্র্যকে ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে। চারিত্র্যানীতির (Morality) ভিত্তি হচ্ছে, এই পার্থক্যজ্ঞান বা ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্র্যকে ভাঙ্গবার চেষ্টা, কারণ, এইটেই সকল প্রকার পাপের মূল; চারিত্র্যানীতি জিনিসটা পূর্ব হতেই রয়েছে, উহা কারও মনগড়া জিনিস নয়, পরে ধর্মশাস্ত্র উহাকে বিধিবদ্ধ করেছে মাত্র। প্রথমে সমাজে নানাবিধ প্রথা স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদের ব্যাখ্যার জন্ত পরে পুরাণের উৎপত্তি। যখন ঘটনাসকল ঘটে যায় তখন তারা যুক্তি-বিচার হতে উচ্চতর কোন নিয়মেই ঘটে থাকে, যুক্তিবিচারের আবির্ভাব হয় পরে, ঐ গুলিকে বোঝাবার জন্ত। যুক্তিবিচারের কোন কিছু ঘটাবার শক্তি নেই, এ যেন ঘটনাগুলো ঘটে যাবার পরে তাদের জীবন

কাটা। যুক্তিতর্ক যেন মানবের কার্যকলাপের ঐতিহাসিক (Historian)।

* * * *

বুদ্ধ একজন মহা বৈদান্তিক ছিলেন, (কারণ, বৌদ্ধধর্ম প্রকৃত-পক্ষে বেদান্তের শাখানিশেষ মাত্র) আর শঙ্করকেও কেউ কেউ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলত। বুদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিলেন—শঙ্কর সেইগুলো সংশ্লেষণ করলেন। বুদ্ধ কখনও বেদ, বা জাতিভেদ, বা পুরোহিত, বা সামাজিক প্রথা—কারো কাছে মাথা নোয়ান নি। তিনি যতদূর পর্যাপ্ত যুক্তিবিচার চলতে পারে, ততদূর নির্ভীকভাবে যুক্তিবিচার করে গেছেন। এরূপ নির্ভীক সত্যানুসন্ধান, আবার সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাসা জগতে কেউ কখনও দেখেনি। বুদ্ধ যেন ধর্মজগতের ওয়াশিংটন ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয় করেছিলেন শুধু জগৎকে দেবার জন্ত, যেমন ওয়াশিংটন মার্কিন জাতির জন্ত করেছিলেন। তিনি নিজের জন্ত কোন কিছুই আকাঙ্ক্ষা করতেন না।

২০শে জুলাই, শনিবার

প্রত্যক্ষানুভূতিই যথার্থ জ্ঞান বা যথার্থ ধর্ম। অনন্ত যুগ ধরে আমরা ধর্ম সম্বন্ধে যদি কেবল কথা কয়ে যাই, তাতে আমরাই আমাদের আত্মজ্ঞান হতে পারে না। কেবল মতবিশেষে বিশ্বাসী হওয়া ও নাস্তিকতায় কিছু তফাৎ নেই। বরং ঐরূপ আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যে নাস্তিকই ভাল লোক। সেই প্রত্যক্ষানুভূতির আলোকে আমি যে কয় পদ অগ্রসর হব, তা থেকে কোন কিছুই

আমাকে কখনও হটাতে পারবে না। কোন দেশ যখন তুমি স্বয়ং গিয়ে দেখলে, তখনই তোমার তার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হল। আমাদের প্রত্যেককে নিজে নিজে দেখতে হবে। আচার্য্যেরা কেবল আমাদের কাছে খাবার এনে দিতে পারেন—ঐ খাদ্য থেকে পুষ্টিলাভ করতে গেলে আমাদের তা খেতে হবে। তর্ক-যুক্তিতে ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক প্রমাণ করতে পারে না, কেবল যুক্তি-সঙ্গত একটা সিদ্ধান্তরূপে তাঁকে উপস্থাপিত করে।

ভগবান্কে আমাদের বাইরে পাওয়া অসম্ভব। বাইরে যা ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হয়, তা আমাদের আত্মারই প্রকাশমাত্র। আমরাই হচ্ছি ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। বাইরে যা দেখা যায়, তা আমাদের ভিতরের জিনিসেরই অতি সামান্য অনুকরণ মাত্র।

আমাদের মনের শক্তিগুলার একাগ্রতাই আমাদের ঈশ্বরদর্শনে সহায়তা করবার একমাত্র যন্ত্র। যদি তুমি একটি আত্মাকে (নিজ আত্মাকে) জানতে পার, তা হলে তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকল আত্মাকেই জানতে পারবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনের একাগ্রতাসাধন হয়—আর বিচার, ভক্তি, প্রাণায়াম ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তি উদ্বুদ্ধ ও বশীকৃত হতে পারে। একাগ্র মন যেন একটি প্রদীপ—এর দ্বারা আত্মার স্বরূপ তন্ন তন্ন করে দেখা যায়।

একপ্রকার সাধনপ্রণালী সকলের উপযোগী হতে পারে না। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন সাধনপ্রণালী যে সোপানের মত একটার পর একটা অবলম্বন করতে হবে, তা নয়। ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদি

সর্বনিম্ন সাধন, তারপর ঈশ্বরকে আমাদের আত্মা থেকে বাইরে দেখা, তারপর আমাদের আত্মার ভিতর ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করা। স্থলবিশেষে, একটার পর আর একটা—এইরূপ ক্রমের আবশ্যিকতা হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কেবল একটা পথেরই আবশ্যিক হয়ে থাকে। “জ্ঞানলাভ করতে হলে তোমাকে কর্ম ও ভক্তির পথ দিয়ে প্রথমে যেতেই হবে”—সকলকেই এ কথা বলার চেয়ে আহাম্মকি আর কি হতে পারে ?

যতদিন না যুক্তিবিচারের অতীত কোন তত্ত্ব লাভ করছ, ততদিন তুমি তোমার যুক্তিবিচার ধরে থাক, আর ঐ অবস্থায় পৌঁছলে তুমি বুঝবে যে, এটা যুক্তিবিচারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস, কারণ, উহা তোমার যুক্তির বিরোধী হবে না। এই যুক্তিবিচার বা জ্ঞানের অতীত ভূমি হচ্ছে সমাধি, কিন্তু স্নায়বীয় রোগের তাড়নায় মূর্ছাবিশেষকে সমাধি বলে ভুল করো না। অনেকে মিছামিছি সমাধি হয়েছে বলে দাবী করে থাকে, পশুর ন্যায় স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানকে সমাধি অবস্থা বলে ভ্রম করে থাকে—এ বড় ভয়ানক কথা। যথার্থ ভাবসমাধি, না স্নায়বীয় রোগ তা বাইরে থেকে নির্ণয় করবার কোন উপায় নেই—যথার্থ সমাধি অবস্থা কি না, নিজে নিজেই তা টের পাওয়া যায়। তবে যুক্তিবিচারের সাহায্য নিলে ভুল ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেতে পারা যায়—সুতরাং একে ব্যতিরেকী পরীক্ষা বলা যেতে পারে ; ধর্মলাভ মানে হচ্ছে যুক্তি তর্কের বাইরে যাওয়া, কিন্তু ঐ ধর্মলাভ করবার পথ একমাত্র যুক্তিবিচারেরই ভিতর দিয়ে। সহজাত জ্ঞান যেন বরফ, যুক্তিবিচার যেন জল, আর অলৌকিক জ্ঞান বা সমাধি

যেন বাষ্প—সব চেয়ে স্থল অবস্থা। একটার পর আর একটা আসে। সব জায়গায়ই এই নিত্য পৌর্বাপর্যা বা ক্রম রয়েছে, যেমন অজ্ঞান, সংজ্ঞা বা আপেক্ষিক জ্ঞান ও বোধি; জড় পদার্থ, দেহ, মন। আর আমরা এই শৃঙ্খলের যে পাবটা (link) প্রথম ধরি সেইটা থেকেই শিকলটা আরম্ভ হয়েছে, আমাদের কাছে এই রকম বোধ হয়। অর্থাৎ কেউ বলে, দেহ থেকে মনের উৎপত্তি, কেউ বা মন থেকে দেহ হয়েছে বলে থাকে। উভয় পক্ষেই বুদ্ধির সমান মূল্য, আর উভয় মতই সত্য। আমাদের ঐ ছটোরই পারে যেতে হবে—এমন জায়গায় যেতে হবে, যেখানে দেহ মন এই দুই-ই নেই। এই যে ক্রম বা পৌর্বাপর্যা—এও মারা।

ধর্ম বুদ্ধিবিচারের পারে, ধর্ম অতিপ্রাকৃতিক। বিশ্বাস অর্থে কিছু মেনে লওয়া নয়—বিশ্বাসের অর্থ সেই চরম পদার্থকে ধারণা করা—এতে হৃদয়কন্দরকে উদ্ভাসিত করে দেয়। প্রথমে সেই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শোন, তারপর বিচার কর—বিচার দ্বারা উক্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কতদূর জানতে পারা যায়, তা দেখ; এর উপর দিয়ে বিচারের বগা বয়ে যাক—তারপর বাকি যা থাকে, সেইটাকে গ্রহণ কর। যদি কিছু বাকি না থাকে, তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি একটা কুসংস্কার এড়ালে। আর যখন তুমি সিদ্ধান্ত করবে যে, কিছুতেই আত্মাকে উড়িয়ে দিতে পারে না, যখন আত্মা সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন তাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক ও সকলকে ঐ আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দাও; সত্য কখন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হতে পারে না—তাতে সকলেরই কল্যাণ হবে। সবশেষে, স্থিরভাবে ও শান্তচিত্তে তার উপর নির্দিখ্যানন কর বা তার ধ্যান

এক একটা করে গুণ বাদ দিতে দিতে ক্রমে সব গুণগুলিই বাদ দিতে পারবে, তখন তুমি ইচ্ছা করলেই সমগ্র জিনিসটাকে তোমার জ্ঞান থেকে দূর করে দিতে পারবে।

যারা উত্তম অধিকারী, তারা যোগে খুব শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করতে পারে—ছমাসে তারা যোগী হতে পারে। যারা তদপেক্ষা নিম্নাধিকারী, তাদের যোগে সিদ্ধিলাভ করতে কয়েক বৎসর লাগতে পারে, আর যে কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত সাধন করলে—অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল সদা সর্বদা সাধনে রত থাকলে দ্বাদশ বর্ষে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। এই সব মানসিক ব্যায়াম না করে কেবল ভক্তিদ্বারাও ঐ অবস্থায় যেতে পারা যায়, কিন্তু তাতে কিছু বিলম্ব হয়। মনের দ্বারা সেই আত্মাকে যে ভাবে দেখা বা ধরা যেতে পারে, তাকেই ঈশ্বর বলে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম ওঁ, সূতরাং ঐ ওঙ্কার জপ কর, তার ধ্যান কর, তার ভিতর যে অপূর্ব অর্থসমূহ নিহিত রয়েছে, তা ভাবনা কর। সর্বদা ওঙ্কার-জপই যথার্থ উপাসনা। ওঙ্কার সাধারণ শব্দ মাত্র নয়, স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ।

* ধর্ম তোমায় নূতন কিছুই দেয় না, কেবল প্রতিবন্ধগুলি সরিয়ে দিয়ে তোমার নিজের স্বরূপ দেখতে দেয়। ব্যাধিই প্রথম মুস্ত বিয়—মুস্ত শরীরই সেই যোগাবস্থা লাভ করবার সর্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ। দৌর্গম বা মন খারাপ হওয়ারূপ বিয়টিকে দূর করা একরূপ অসম্ভব বললেই হয়। তবে একবার যদি তুমি ব্রহ্মকে জানতে পার, পরে আর তোমার মন খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সংশয়, অধ্যবসায়ের অভাব, ভ্রান্ত ধারণা—এগুলিও অন্ত্যন্ত বিয়।

* * * *

প্রাণ হচ্ছে দেহস্থ অতি সূক্ষ্ম শক্তি—দেহের সর্বপ্রকার গতির কারণস্বরূপ। প্রাণ সর্বশুদ্ধ দশটি—তন্মধ্যে পাঁচটি প্রধান, আর পাঁচটি অপ্রধান। একটি প্রধান প্রাণপ্রবাহ উপরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, অপরগুলি নীচের দিকে। প্রাণায়াম অর্গ শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মনের দ্বারা প্রাণসমূহকে নিয়মিত করা। শ্বাস যেন কাষ্ঠস্বরূপ, প্রাণ বাষ্পস্বরূপ এবং শরীরটা যেন ইঞ্জিন। প্রাণায়ামে তিনটি ক্রিয়া আছে—পূরক—শ্বাসকে ভিতরে টানা, কুন্তক—শ্বাসকে ভিতরে ধারণ করে রাখা, আর রেচক—বাইরে শ্বাস নিক্ষেপ করা।

* * * *

গুরু হচ্ছেন সেই আধার, যার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি লোকের কাছে পৌঁছে থাকে। যে কেউ শিক্ষা দিতে পারে বটে, কিন্তু গুরুই শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করে থাকেন, তাই-তেই আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপ ফল হয়ে থাকে। শিষ্যদের মধ্যে পরস্পর ভাই ভাই সম্বন্ধ, আর ভারতের আইনে এই সম্বন্ধ স্বীকার করে থাকে। গুরু তাঁর পূর্ব-পূর্ব অচার্যাদের কাছ থেকে যে মন্ত্র বা ভাবশক্তিময় শব্দ পেয়েছেন, তাই শিষ্যে সংক্রমিত করেন—গুরু ব্যতীত সাধন ভজন কিছু হতে পারে না। বরং বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। সাধারণতঃ গুরুর সাহায্য না নিয়ে এই সকল যোগ অভ্যাস করতে গেলে কামের প্রাবল্য হয়ে থাকে, কিন্তু গুরুর সাহায্য থাকলে প্রায়ই এটা ঘটে না। প্রত্যেক ইষ্টদেবতার এক একটি মন্ত্র আছে। ইষ্ট অর্থে বিশেষ বিশেষ

উপাসকের বিশেষ বিশেষ আদর্শকে বুঝিয়ে থাকে। মন্ত্র হচ্ছে ঐ ভাববিশেষব্যাঞ্জক শব্দ। ঐ শব্দের ক্রমাগত জপের দ্বারা আদর্শটিকে মনে দৃঢ়ভাবে রাখবার সহায়তা হয়ে থাকে। এইরূপ উপাসনা-প্রণালী ভারতের সকল সাধকদের মধ্যে প্রচলিত।

২৩শে জুলাই, মঙ্গলবার। (ভগবদ্গীতা—কর্মযোগ)

কর্মের দ্বারা মুক্তিলাভ করতে হলে নিজেকে কর্মে নিযুক্ত কর, কিন্তু কোন কামনা করো না—ফলাকাঙ্ক্ষা যেন তোমার না থাকে। এইরূপ কর্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে—ঐ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়। জ্ঞানলাভ করবার পূর্বে কর্মত্যাগ করলে তাতে দুঃখই এসে থাকে। আত্মার জন্য কর্ম করলে তা থেকে কোন বন্ধন আসে না। কর্ম থেকে সুখের আকাঙ্ক্ষাও করো না, আবার কর্ম করলে কষ্ট হবে—এ ভয়ও করো না। দেহমনই কাজ করে থাকে, আমি করি না। সদা সর্বদা আপনাকে এই কথা বল এবং এটি প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা কর। চেষ্টা কর, যেন তুমি কিছু করছ—এ জ্ঞানই তোমার না হয়।

সমুদয় কর্ম ভগবানে অর্পণ কর। সংসারে থাক, কিন্তু সংসারের হয়ে যেও না—পদ্মপত্রের মূল যেমন পাতকের মধ্যে থাকে কিন্তু তা যেমন সদাই শুদ্ধ থাকে, সেইরূপ লোকে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুক না, তোমার ভালবাসা যেন কারও প্রতি কম না হয়। অন্ধ যে, তার বর্ণের জ্ঞান থাকতে পারে না—সুতরাং আমার নিজের ভিতর দোষ না থাকলে অপরের ভিতর দোষ দেখ বো কি করে? আমরা আমাদের নিজের ভিতর যা রয়েছে, তার সঙ্গে

বাইরে যা দেখতে পাই, তার তুলনা করি, ও তদনুসারেই কোন বিষয়ে আমাদের মতামত দিবে থাকি। যদি আমরা নিজেরা পবিত্র হই, তবে বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পাব না। বাইরে অপবিত্রতা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তার অস্তিত্ব থাকবে না। প্রত্যেক নরনারী, বালকবালিকার ভিতর ব্রহ্মকে দর্শন কর, অন্তর্জ্যোতিঃ দ্বারা তাঁকে দেখ; যদি সর্বত্র সেই ব্রহ্মদর্শন হয়, তবে আমরা আর কিছু দেখতে পাব না। এই সংসারটাকে চেও না, কারণ, যে যা চায় সে তাই পায়। ভগবান্কে—কেবল ভগবান্কেই অন্বেষণ কর। যত অধিক শক্তি লাভ হবে, ততই বন্ধন আসবে, ততই ভয় আসবে। একটা সামান্য পিপড়ের চেয়ে আমরা কত অধিক ভীতু ও দুঃখী। এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের বাইরে ভগবানের কাছে যাও। স্রষ্টার তত্ত্ব জানবার চেষ্টা কর, সৃষ্টের তত্ত্ব জানবার চেষ্টা করো না।

“আমিই কর্তা ও আমিই কার্য।” “যিনি কামক্রোধের বেগ ধারণ করতে পারেন, তিনি মহাযোগী পুরুষ।”

“অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই কেবল মনকে নিরোধ করা যেতে পারে।”

* * * *

আমাদের পূর্বপুরুষেরা চূপচাপ করে বসে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করে গেছেন, আর আমাদেরও ঐ সব বিষয়ে খাটাবার জন্ত যত্ন রাখা হয়েছে। কিন্তু এখন আমরা ঐকাকড়ির জন্ত যে রকম ছোটোছোটো আরম্ভ করেছি, তাতে সেটা নষ্ট হবার যোগাড় হচ্ছে।

✓ শরীরের নিজেরই নিজেকে আরোগ্য করবার একটা শক্তি আছে—আর মানসিক অবস্থা, ঔষধ, ব্যায়াম প্রভৃতি নানাবিষয় এই আরোগ্য-শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে। যত দিন আমরা ভৌতিক অবস্থাচক্রের দ্বারা বিচলিত হই, ততদিন আমাদের জড়ের সহায়তার প্রয়োজন। আমরা যত দিন না স্নায়ুসমূহের দাসত্ব কাটাতে পারি, ততদিন তাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

আমাদের সাধারণ জ্ঞানভূমির নীচে মনের আর এক ভূমি আছে—তাকে অজ্ঞানভূমি বলা যেতে পারে—আমরা যাকে সমগ্র মানুষ বলি, জ্ঞান তার একটা অংশমাত্র। দর্শনশাস্ত্র মন সম্বন্ধে কতকগুলো আন্দাজমাত্র। ধর্ম কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত—প্রত্যক্ষ দর্শন—যা জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি—তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। মন যখন জ্ঞানেরও অতীত ভূমিতে চলে যায়, তখন সে যথার্থ বস্তু, যথার্থ বিষয়কেই উপলব্ধি করে। আপ্ত তাঁদের বলে, যারা ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা যে উপলব্ধি করেছেন, তার প্রমাণ এই যে, তুমিও যদি তাঁদের প্রণালী অনুসরণ কর, তুমিও দেখবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ প্রণালী ও বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন। একজন জ্যোতিষী বা বায়বের সমস্ত হাঁড়িকুড়ির সাহায্য নিয়ে শনিগ্রহের বলয়গুলি দেখাতে পারে না—দেখাতে হলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার। সেইরূপ ধর্মের মহান সত্যসমূহ দেখতে হলে, যারা পূর্বেই সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের উপদিষ্ট প্রণালীগুলির অনুসরণ করতে হবে। যে বিজ্ঞান যত বড়, তার শিক্ষা করবার উপায়ও তত নানাবিধ। আমরা

সংসারে আস্বার পূর্বেই ভগবান্ এ থেকে বেরবার উপায়ও করে রেখেছেন। সুতরাং আমাদের চাই শুধু সেই উপায়টাকে জানা। তবে বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে মারামারি করো না। কেবল যাতে তোমার অপবোক্তানুভূতি হয়, তার চেষ্টা কর, আর যে সাধন-প্রণালী তোমার পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী হয়, তাই অবলম্বন কর। তুমি আম খেয়ে যাও, অপরে ঝড়িটা নিয়ে মারামারি করে মরুক। খৃষ্টকে দর্শন কর—তবেই তুমি যথার্থ খৃষ্টান হবে। আর সবই বাজে কথা মাত্র—আর কথা যত কম হয় ততই ভাল।

যার জগতে কিছু বার্তা বহন করবার বা শিক্ষা দেবার থাকে, তাকেই বার্তাবহ বা দূত বলা যেতে পারে—দেবতা থাকলেই তবে তাকে মন্দির বলা যেতে পারে। এর বিপরীতটা সত্য নয়।

ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষা কর, যতদিন পর্য্যন্ত না তোমার মুখ ব্রহ্মবিদের মত প্রতিভাত হয়, যেমন সত্যকামের হয়েছিল।

আমারও আন্দাজী জ্ঞান, অপরেরও আন্দাজী জ্ঞান—কাজেই ঝগড়া বাধে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন করে তারই সঙ্গকে কথা কও দেখি—এমন মনুষ্যহৃদয় নেই, যা তাকে স্বীকার করতে বাধ্য না হয়। প্রত্যক্ষানুভূতি করাতেই সেন্ট পল্কে (St. Paul) ইচ্ছার বিরুদ্ধে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল।

ঐ, অপরাহ্ন (মধ্যাহ্নভোজনের পর অল্পক্ষণ কথাবার্তা হয়— সেই কথাবার্তা প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেন—)

- ভ্রমই ভ্রমকে সৃষ্টি করে থাকে। ভ্রম নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করছে, আবার নিজেকেই নিজে নষ্ট করছে। একেই বলে মায়া। তথাকথিত সমুদয় জ্ঞানের ভিত্তিই মায়া। আবার এমন এক

সময় আসে—যখন লোকে বুঝতে পারে যে, ঐ জ্ঞান অত্যাশ্চর্য-দোষহীন। তখন ঐ জ্ঞান নিজেই নিজেকে নষ্ট করতে চেষ্টা করে। ‘ছেড়ে দাও বজ্জু—যাহে আকর্ষণ।’ ভ্রম কখনও আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। যখনই আমরা সেই দড়িটাকে ধরি, মায়ার সহিত নিজেদের মিশিয়ে ফেলি, তখনই সে আমাদের উপর শক্তি বিস্তার করে। মায়ী যেখানে যাবার যাক্ তাকে ছেড়ে দাও, কেবল সাক্ষিস্বরূপ হয়ে থাক। তা হলেই অবিচলিত থেকে জগৎপ্রপঞ্চরূপ ছবির সৌন্দর্য্যো মুগ্ধ হতে পারবে।

২৪শে জুলাই, বুধবার

যিনি যোগে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে যোগসিদ্ধি-গুলি বিঘ্ন নয়, কিন্তু প্রবর্তকের পক্ষে সেগুলি বিঘ্নস্বরূপ হতে পারে, কারণ, ঐগুলি প্রয়োগ করতে করতে ঐ সবে একটা আনন্দ ও বিশ্বয়ের ভাব আসতে পারে। সিদ্ধি বা বিভূতিগুলি যোগ সাধনার পথে যে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে, তারই চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু সেগুলি মন্ত্ররূপ, উপবাসাদি তপস্যা, যোগসাধন, এমন কি, ঔষধ-বিশেষের ব্যবহারের দ্বারাও আসতে পারে। যে যোগী যোগ-সিদ্ধিসমূহেও বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং সমুদয় কর্মফল ভাগ করেন, তাঁর ধর্ম্মমেঘ নামে সমাধি লাভ হয়। যেমন মেঘ বর্ষণ করে, তেমনি তিনি যে যোগাবস্থা লাভ করেন, তাতে চারিদিকে ধর্ম্ম বা পবিত্রতার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

যখন একরূপ প্রত্যয়ের ক্রমাগত আবৃত্তি হতে থাকে, তখনই সেটা ধ্যানপদবাচ্য, কিন্তু সমাধি এক বস্তুতেই হয়ে থাকে।

মন আত্মার জ্ঞেয়, কিন্তু মন স্বপ্রকাশ নয়। আত্মা কোন নস্তুর কারণ হতে পারে না। কিরূপে হবে? পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হবে কিরূপে? পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কখন প্রকৃতিতে যুক্ত হন না—অবিবেকের দরুণ পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হয়েছে বোধ হয়।

* * * *

লোককে করুণার চক্ষে না দেখে, অথবা তারা অতি হীনদশায় পড়ে আছে, এ রকম মনে না করে, অপরকে সাহায্য করতে শিক্ষা কর। শত্রু মিত্র উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি হতে শিক্ষা কর; যখন তা হতে পারবে, আর যখন তোমার কোন বাসনা থাকবে না, তখন তোমার চরমাবস্থা লাভ হয়েছে বুঝতে হবে।

বাসনারূপ অস্থিতবৃত্তকে অনাসক্তিরূপ কুঠার দ্বারা কেটে ফেল, তা হলেই তা একেবারে চলে যাবে—উহা ত একটা ভ্রমমাত্র। “যার মোহ ও শোক চলে গেছে, যিনি সঙ্গদোষ জয় করেছেন, তিনি কেবল ‘আজাদ’ বা মুক্ত।”

কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে ভালবাসা হচ্ছে বন্ধন। সকলকে সমানভাবে ভালবাস—তা হলে সব বাসনা চলে যাবে।

সর্বভক্ষক কাল এলে সকলকেই যেতে হবে। অতএব পৃথিবীর উন্নতির জন্ত, ক্ষণস্থায়ী প্রজাপতিকে রঙচঙে করবার জন্ত কেন চেষ্টা কর? সবই ত শেষে চলে যাবে। সাদা ইঁহুরের মত খাঁচায় বসে কেবল ডিগবাজি খেয়ো না, সদাই ব্যস্ত অথচ প্রকৃত কাজ কিছু হচ্ছে না। বাসনা ভালই হক, আর মন্দই হক, বাসনা জিনিসটাই খারাপ। এ যেন কুকুরের মত মাংসখণ্ড পাবার জন্ত

দিন-রাত লাকান অথচ মাংসের টুকরোটা ক্রমাগত সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আর শেষে কুকুরের মত মৃত্যু। ও রকম হয় না। সমস্ত বাসনা নষ্ট করে ফেল।

* * * *

পারমাণ্ব্য যখন মায়াধীশ, তখন তাঁকে বলে ঈশ্বর, আবার তিনি যখন মায়ার অধীন, তখন তিনিই জীবাশ্মাপদবাচ্য। সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চের সমষ্টিই মায়া, একদিন সেটা একেবারে উড়ে যাবে।

বৃক্ষের বৃক্ষফটা মায়া—গাছ দেখবার সময় আমরা প্রকৃত-পক্ষে ভগবৎস্বরূপকেই মায়াবৃতভাবে দেখছি। কোন ঘটনার সম্বন্ধে 'কেন' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটাই মায়ার অন্তর্গত। স্মৃতরাং মায়া কিরূপে এল, এ প্রশ্নটিই বৃথা প্রশ্ন, কারণ, মায়ার মধ্যে থেকে ওর উত্তর কখন দেওয়া যেতে পারে না, আর যখন মায়ার পারে চলে যাবে, তখনকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে? মন্দ বা মায়া বা অসদৃষ্টিই 'কেন' এই প্রশ্নের সৃষ্টি করে কিন্তু 'কেন' প্রশ্ন থেকে মায়া আসে না—মায়াই ঐ 'কেন' জিজ্ঞাসা করে। ভ্রম ভ্রমকে নষ্ট করে দেয়। যুক্তিবিচার নিজেই একটা বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্মৃতরাং এটা একটা বৃত্তস্বরূপ, কাজেই তাকে নিজেকে নিজে নষ্ট করতে হয়। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি একটা আনুমানিক জ্ঞান, কিন্তু আবার সব আনুমানিক জ্ঞানের ভিত্তি অনুভূতি।

অজ্ঞানে যখন ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই তাকে দেখা যায়—স্বতন্ত্রভাবে ধরলে সেটা শূন্যস্বরূপ বৈ কিছুই নয়। মেঘে সূর্য্যাকিরণ প্রতিফলিত না হলে মেঘকে দেখাই যায় না।

চারজন লোক দেশভ্রমণ করতে করতে একটা খুব উঁচু দেয়ালের কাছে এসে উপস্থিত হন। প্রথম পথিকটি অতি কষ্টে দেয়াল বেয়ে উঠল, আর পেছন দিকে চেয়ে না দেখেই দেয়ালের ওপারে লাফ দিয়ে পড়ল। দ্বিতীয় পথিকটি দেয়ালে উঠল, ভিতরের দিকে দেখলে, আর আনন্দধ্বনি করে ভিতরে পড়ল। তারপর তৃতীয়টিও দেয়ালের মাথায় উঠল, তার সঙ্গীরা কোথায় গিয়েছে, সে দিকে লক্ষ্য করে দেখলে, তারপর আনন্দে হাঃ হাঃ করে হেসে তাদের অনুসরণ করলে। কিন্তু চতুর্থ পথিকটি দেয়ালে উঠে তার সঙ্গীদের কি হল, লোককে জানাবার জ্ঞান ফিরে এল। এই সংসার-প্রপঞ্চের বাইরে যে কিছু আছে, আমাদের কাছে তার প্রমাণ হচ্ছে—যে সকল মহাপুরুষ মায়ার দেয়াল বেয়ে ভিতরের দিকে পড়েছেন, তাঁরা পড়বার আগে যে আনন্দে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠেন, সেই হান্ত।

* * * *

আমরা যখন সেই পূর্ণ সত্তা থেকে নিজেদের পৃথক করে তাতে কতকগুলি গুণের আরোপ করি, তখনই আমরা তাঁকে ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর হচ্ছেন—এই জগৎপ্রপঞ্চের মূল সত্য আমাদের মনের দ্বারা যেক্রমভাবে দৃষ্ট হয়। আর সয়তান বলতে—জগতের সমুদয় মন্দ ও হুঃখরাশিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন যে ভাবে দেখে, তাই বুঝায়।

২৫শে জুলাই, বৃহস্পতিবার। (পাতঞ্জল যোগসূত্র)

কার্য তিন প্রকারের হতে পারে—কৃত (যা তুমি নিজে করছ), কারিত (যা অপরের দ্বারা করাচ্ছ), আর অনুমোদিত

(অপরে করুছে তাতে তোমার অনুমোদন আছে, কোন আপত্তি নেই)। আমাদের উপর এই তিন প্রকার কার্যের ফল প্রায় একরূপ।

পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি খুব প্রবল হয়ে থাকে। ব্রহ্মচারীকে কায়মনোবাক্যে মৈথুনবর্জিত হতে হবে। দেহটার যত্ন ভুলে যাও। যতটা পার, দেহজ্ঞান ছেড়ে দাও।

যে অবস্থায় স্থিরভাবে ও সুখে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারা যায়, তাকেই আসন বলে। সর্বদা অভ্যাসের দ্বারা এবং মনকে অনশ্রুভাবে ভাবিত করতে পারলে এটি হতে পারে।

একটা বিষয়ে সদা সর্বদা চিন্তাবৃত্তি প্রবাহিত করার নাম ধ্যান। স্থির জলে যদি একটা প্রস্তরখণ্ড ছুড়ে ফেলা যায়, তা হলে জলে অনেকগুলি বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয়—বৃত্তগুলি সব পৃথক পৃথক অথচ পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য্য করুছে। আমাদের মনের ভিতরও এইরূপ বৃত্তিপ্রবাহ চলেছে; তবে আমাদের ভিতর সেটি অজ্ঞাতসারে হচ্ছে, আর যোগীদের ভিতর ঐরূপ কার্য্য তাঁদের জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। আমরা যেন মাকড়সার মত নিজের জালের মধ্যে রয়েছি, যোগ অভ্যাসের দ্বারা আমরা মাকড়সার মত জালের যে অংশে ইচ্ছা যেতে পারি। যারা অযোগী তারা যেখানে রয়েছে, সেই নির্দিষ্ট স্থলবিশেষে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়।

* * * *

অপরকে হিংসা করলে তাতে বন্ধন আনে ও আমাদের সম্মুখ

থেকে সত্যকে ঢেকে ফেলে। শুধু নিষেধাত্মক ধর্মসাধনাই যথেষ্ট নয়। আমাদের মায়াকে জয় করতে হবে, তা হলেই মায়া আমাদের পেছনে ছুটবে। যখন কোন বস্তু আমাদের আর বাধতে না পারে, তখনই সেই বস্তু পাবার আমাদের যথার্থ অধিকার হয়। যখন ঠিক ঠিক বন্ধন ছুটে যায়, তখন সবই আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়। যাদের কোন বস্তুর অভাব নেই, তারাই প্রকৃতিকে জয় করে থাকে।

এমন কোন মহাআর শরণাগত হও, যার নিজের বন্ধন ছুটে গেছে, কালে তিনিই রূপাবশে তোমায় মুক্ত করে দেবেন। ঈশ্বরের শরণাগতি এর চেয়ে উচ্চভাব, কিন্তু অতি কঠিন! প্রকৃতপক্ষে এটি কার্যো পরিণত করতে পারে, একরূপ লোক এক শতাব্দীর ভিতর জোর একজন দেখা যায়। কিছু অনুভব করো না, কিছু জেনো না, কিছু করো না, কিছু নিজের বলে রেখো না—সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ কর, আর সর্কাস্তঃকরণে বল, ‘প্রভো! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হক’।

আমরা বদ্ধ—এ ভাব আমাদের স্বপ্নমাত্র। জাগো—বন্ধনটা সব চলে যাক। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, এই মায়া-মরু অতিক্রম করবার এই একমাত্র উপায়।

“শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অবেষণ;

নিজ হস্তে রজ্জু যাছে আকর্ষণ।

তাজ্জ অতএব বৃথা শোকরাশি,

ছেড়ে দাও রজ্জু, বল হে সন্ন্যাসী,

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।”

আমরা যে অপরের উপর দয়া প্রকাশ করতে পারছি, এ আমাদের একটা বিশেষ সৌভাগ্য—কারণ, ঐরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারাই আমাদের আত্মোন্নতি হবে। লোকে যে কষ্ট পাচ্ছে, তার কারণ, তার উপকার করে আমাদের কল্যাণ হবে। অতএব দাতা দান করবার সময় গ্রহীতার সামনে হাঁটুগেড়ে বসুন এবং নিজেকে ধন্য জ্ঞান করুন, গ্রহীতা সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকে দানের অনুমতি করুন। সব প্রাণীর পশ্চাতে সেই প্রভুকে দর্শন করে তাঁকেই দান কর। যখন আমরা আর মন্দ কিছু দেখতে পাব না, তখন আমাদের পক্ষে জগৎপ্রপঞ্চই আর থাকবে না, কারণ, প্রকৃতির অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদেরকে এই ভ্রম হতে মুক্ত করা। অসম্পূর্ণতা বলে কিছু আছে, এইটে ভাবাই অসম্পূর্ণতার সৃষ্টি করা। আমরা পূর্ণস্বরূপ ও ওজঃস্বরূপ, এই চিন্তাতেই কেবল এটা দূর হতে পারে। যতই ভাল কাজ কর না কেন, কিছু না কিছু মন্দ তাতে লেগে থাকবেই থাকবে। তবে সমুদয় কার্য নিজের ব্যক্তিগত ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে করে যাও, সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ কর, তা হলে, ভাল মন্দ কিছুই তোমার অভিভূত করতে পারবে না।

কাজ করাটা ধর্ম নয় বটে, তবে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করলে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে অপরকে করণার চক্ষে দেখা অজ্ঞানমাত্র, কারণ, আমরা দুঃখিত হব কার জন্ত? তুমি ঈশ্বরকে করণার চক্ষে দেখতে পার কি? আর, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু আছে কি? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে তোমার আত্মোন্নতির জন্ত এই জগৎরূপ নৈতিক ব্যায়ামশালা

প্রদান করেছেন, কিন্তু কখনও ভেবো না, তুমি এই জগৎকে সাহায্য করতে পার। তোমায় যদি কেউ গাল দেয়, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কারণ, গালাগালি বা অভিশাপ জিনিসটা কি, তা দেখবার জন্তু সে যেন তোমার সম্মুখে একখানি আরসি ধরছে, আর তোমাকে আত্মসংযম অভ্যাস করবার অবসর দিচ্ছে। সুতরাং তাকে আশীর্বাদ কর ও সুখী হও। অভ্যাস করবার অবকাশ না হলে শক্তির বিকাশ হতে পারে না, আর আরসি সামনে না ধরলে আমরা নিজের মুখ নিজে দেখতে পাই না।

অপবিত্র চিন্তা অপবিত্র ক্রিয়ার মতই দোষাবহ। কামেচ্ছাকে দমন করলে তা থেকে উচ্চতম ফল লাভ হয়। কামশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর, কিন্তু নিজেকে পুরুষত্বহীন করো না, কারণ তাতে কেবল শক্তির অপচয় হবে মাত্র। এই শক্তিটা যত প্রবল থাকবে এর দ্বারা তত অধিক কাজ হতে পারবে। প্রবল জলের শ্রোত পেলোই তার সহায়তায় খনির কার্য্য করা যেতে পারে।

আজকাল আমাদের বিশেষ প্রয়োজন এই যে, আমাদের জানতে হবে, একজন ঈশ্বর আছেন, আর এখানে এবং এখনই আমরা তাঁকে অনুভব করতে—দেখতে পারি। চিকাগোর একজন অধ্যাপক বলেন, “এই জগতের তত্ত্বাবধান কর, ঈশ্বর পরলোকের খবর নেবেন।” কি আশান্বকি কথা! যদি আমরা এই জগতের সব বন্দোবস্ত করতে সমর্থ হই, তবে পরলোকের তার নেবার জন্তু আবার অকারণ একজন ঈশ্বরের কি দরকার?

২৬শে জুলাই শুক্রবার। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

সব বস্তুকে ভালবাস, কেবল আত্মার ভিতর দিয়ে এবং আত্মার জন্ত। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, “আত্মার দ্বারাই আমরা সব জিনিস জানতে পারছি”। আত্মা কখন জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না—যে নিজে জ্ঞাতা, সে কি করে জ্ঞেয় হবে? যিনি আপনাকে আত্মা বলে জানতে পারেন, তাঁর পক্ষে আর কোন বিধিনিষেধ থাকে না। তিনি জানতে পারেন, তিনিই এই জগৎ-প্রপঞ্চস্বরূপ, আবার এর স্রষ্টাও বটে।

* * * *

পুরাতন পৌরাণিক ব্যাপারগুলিকে রূপকের আকারে চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করলে এবং তাদের নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়, আর এটা বাস্তবিক দুর্বলতা। সত্যের সঙ্গে যেন কখন কিছুর আপোষ না করা হয়। সত্যের উপদেশ দাও, আর কোন প্রকার কুসংস্কারের যুক্তি দিতে চেষ্টা করো না, অথবা সত্যকে শিক্ষার্থীর ধারণাশক্তির উপযোগী স্বরূপে জ্ঞান নাবিয়ে এনো না।

২৭শে জুলাই, শনিবার। (কঠোপনিষৎ)

অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারও কাছে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করতে যেও না। অপরের কাছে তা কেবল

কথার কথা মাত্র। প্রত্যক্ষানুভূতি হলে মানুষ ধর্মাদর্শ, ভূতভবিষ্যৎ, সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের পারে চলে যায়। নিষ্কাম ব্যক্তি সেই আত্মাকে দর্শন করেন, আর তাঁর আত্মার শাশ্বতী শান্তি এসে থাকে। মুখে বলা, বিচার, শাস্ত্রপাঠ ও বুদ্ধির চূড়ান্ত পরিচালনা করা, এমন কি, বেদ পর্য্যন্ত—এ সকল কোনটাই মানুষকে সেই আত্মজ্ঞান দিতে পারে না।

আমাদের ভিতর জীবাত্মা পরমাত্মা দুইই আছেন। জ্ঞানীরা জীবাত্মাকে ছায়াস্বরূপ, আর পরমাত্মাকে বথার্থ সূর্যাস্বরূপ বলে জানেন।

আমরা যদি মনটাকে ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত না করি, তাহলে আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন জ্ঞানই লাভ করতে পারি না। মন এই বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করে থাকে। ইন্দ্রিয়গুলিকে বাইরে যেতে দিও না—তা হলে দেহ এবং বহির্জগত এই উভয়েরই হাত এড়াবে।

এই যে অজ্ঞাত বস্তুটাকে আমরা বহির্জগত বলে দেখছি, মৃত্যুর পর নিজ নিজ মনের অবস্থানুসারে একেই কেহ স্বর্গ, কেহ বা নরক বলে দেখে। ইহলোক পরলোক—এ দুটোই স্বপ্নমাত্র, শেষোক্তটা আবার প্রথমটার ছাঁচে গড়া। ঐ দুই প্রকার স্বপ্ন থেকেই মুক্ত হও, জ্ঞান—সবই সর্বব্যাপী, সবই বর্তমান। প্রকৃতি দেহ ও মনেরই মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত্যু হয় না; আমরা বাইও না, আসিও না। এই যে স্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষটা রয়েছে—এর সত্তা প্রকৃতির ভিতর। স্মৃতরাং এর জন্মও হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে। কিন্তু আত্মা—ধাকে আমরা স্বামী

বিবেকানন্দরূপে দর্শন করছি—তার কখন জন্ম হয়নি ;
তিনি কখনও মরবেন না ; তিনি অনন্ত ও অপরিণামী
সত্তা ।

আমরা মনঃশক্তিকে পাঁচটা ইন্দ্রিয়শক্তিতেই ভাগ করি, অথবা
একটা শক্তিরূপে দেখি, মনঃশক্তি একরকমই থাকে । একজন
অন্ধ বলে, ‘প্রত্যেক জিনিসের এক এক বিভিন্ন প্রকার
প্রতিধ্বনি আছে, সুতরাং আমি হাততালি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের
প্রতিধ্বনি দ্বারা আমার চতুর্দিকে কোথায় কি আছে, ঠিক ঠিক
বলতে পারি ।’ সুতরাং একজন অন্ধ একজন চক্ষুশালী লোককে
ঘন কুয়াসার ভিতর দিয়ে অনায়াসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে
পারে । কারণ, তার কাছে কুয়াসা বা অন্ধকারে কিছু তফাৎ
হয় না ।

মনকে সংযত কর, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরোধ কর, তা হলেই তুমি
যোগী হলে ; তারপর বাকি যা কিছু সবই হবে । শুনতে, দেখতে,
ভ্রাণ বা স্বাদ নিতে অস্বীকার কর ; বহিরিন্দ্রিয়গুলি থেকে মনঃ-
শক্তিকে সরিয়ে নাও । তুমি ত অজ্ঞাতসারে এটি সদা সর্বদাই
করছ—যেমন, যখন তোমার মন কোন বিষয়ে মগ্ন থাকে ;
সুতরাং তুমি জ্ঞাতসারেও এটি করবার অভ্যাস করতে পার ।
মন যেখানে ইচ্ছা ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রয়োগ করতে পারে । আমাদের
দেহের সাহায্যেই যে কাজ করতে হবে, এই মূল কুসংস্কারটি
একেবারে ছেড়ে দাও । প্রকৃতপক্ষে ত তা নয় । নিজের ঘরে
গিয়ে বস, আর নিজের অন্তরাশ্রয় ভিতর থেকে উপনিষদের
তত্ত্বগুলি আবিষ্কার কর । তুমি সকল বিষয়ের অনন্ত ধনিস্বরূপ,

ভূত-ভবিষ্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যতদিন না সেই ভিতরের অস্তুর্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাহিরের উপদেশ সব বৃথা। বাহিরের শিক্ষাদ্বারা যদি হৃদয়স্বরূপ গ্রন্থ খুলে যায়, তবেই তার কিছু মূল্য আছে বলা যেতে পারে।

আমাদের ইচ্ছাশক্তিই সেই 'ক্ষুদ্র ধীর বানী,' সেই যথার্থ নিয়ন্ত্রা—যে আমাদের সঙ্গী বিধিনিষেধ দিচ্ছে—বলছে এই কাজ কর, এই কাজ করো না। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের যত বন্ধনের মধ্যে এনেছে। অজ্ঞ ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি তাকে বন্ধনে ফেলে, আর সেইটেই জ্ঞানপূর্বক পরিচালিত হলে আমাদের মুক্তি দিতে পারে। সহস্র সহস্র উপায়ে ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা যেতে পারে, প্রত্যেক উপায়ই এক এক প্রকার যোগ; তবে প্রণালীবদ্ধ যোগের দ্বারা এটা খুব শীঘ্র সাধিত হতে পারে। ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা খুব নিশ্চিতরূপে কৃতকার্য হওয়া যায়। মুক্তিলাভ করবার জন্ত তোমার যত প্রকার শক্তি আছে, সব প্রয়োগ কর—কর্ম, বিচার, উপাসনা, ধ্যান—সমুদয় অবলম্বন কর, সব পাল একসঙ্গে তুলে দাও, সব কলগুলি পূরাদমে চালাও, আর গন্তব্যস্থানে উপনীত হও। যত শীঘ্র পার, ততই ভাল।

* * * *

খ্রীষ্টিয়ানদের ব্যাপ্টিজ্‌ম্ (Baptism) সংস্কার একটা বাহ্যশুদ্ধি-স্বরূপ—এটি অন্তঃশুদ্ধির প্রতীক বা সূচকস্বরূপ। বৌদ্ধধর্ম থেকে এর উৎপত্তি।

খ্রীষ্টিয়ানদের ইউক্যারিস্ট* নামক অনুষ্ঠান অসভ্য জাতিসমূহের একটি অতি প্রাচীন প্রথার অবশেষ বা চিহ্নমাত্র। ঐসব অসভ্য জাতি কখন কখন তাদের বড় বড় নেতারা যে সব গুণে মহৎ হয়েছেন, সেইগুলি পাবার আশায় তাঁদের মেরে কেবল এবং তাঁদের মাংস খেত। তাদের বিশ্বাস ছিল, যে সকল শক্তিতে তাদের নেতা বীর্যবান, সাহসী ও জ্ঞানী হয়েছিলেন, এই উপায়ে সেই শক্তিগুলি তাদের ভিতর আসবে, আর কেবল একব্যক্তি ঐরূপ বীর্যবান ও জ্ঞানী না হয়ে সমগ্র জাতিটাই ঐরূপ হবে। নরবলি প্রথা যাহুদীজাতির ভিতরও ছিল, আর তাঁদের ঈশ্বর জিহোবা ঐ প্রথার জন্ত তাদের অনেক শাস্তি দিলেও, সেটা তাদের ভিতর থেকে একেবারে লোপ হয়নি। যীশু নিজে শান্তপ্রকৃতি ও প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁকে যাহুদীজাতির বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রচার করবার চেষ্টার ফলে, খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে এই মতবাদের উৎপত্তি হল যে, যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিস্বরূপে নিজেকে বলি দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করলেন। যাহুদীদের মধ্যে পূর্বে এক প্রথা ছিল—তাঁদের পুরোজিহোবা

* Eucharist or the Lord's Supper :—বাইবেলের টেম্পোনে লিখিত আছে, যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বে শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া রুটি ও মজা ঈশ্বরোদ্দেশে নিবেদন করিয়া বলেন, 'এই রুটি আমার মাংস এবং এই মজা আমার রক্ত।' তৎপরে শিষ্যগণকে উহা খাইতে বলেন। খ্রীষ্টানগণ এখনও ঐ দিনের সান্ন্যাসরিক পালন করিয়া থাকেন ও উহাকে পূর্বোক্ত নামে অভিহিত করেন।

যন্ত্রপাঠ করে ছাগলের উপর মানুষের পাপ চাপিয়ে দিলে তাকে
জ্বলে তাড়িয়ে দিতেন—এখানে ছাগলের বদলে মানুষ, এই
তফাৎ। এই নিষ্ঠুর ভাব প্রবেশ করার দক্ষণ খ্রীষ্টধর্ম, খ্রীষ্টের
যথার্থ শিক্ষা থেকে অনেক দূর তফাৎ হয়ে পড়ল এক তার ভিতর
পরের উপর অত্যাচার করবার ও অপরের রক্তপাত করবার
ভাব এল।

* * * *

কোন কাজ করবার সময় বলো না যে, 'এটা আমার কর্তব্য'
বরং বল 'এটা আমার স্বভাব।'

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার হয়
না। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই তুমি ভগবানকে
লাভ করবে।

* * * *

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ব্রাহ্মণ জাতি নিজেদের সর্ব-
প্রকার বিধিনিষেধের অতীত বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা
নিজেদের ভূদেব বলে দাবি করেন। তাঁরা খুব দরিদ্রভাবে থাকেন,
তবে তাঁদের দোষ এই যে, তাঁরা আধিপত্য বা প্রভুত্ব খোঁজেন।
যাই হক, ভারতে প্রায় ৬ কোটি ব্রাহ্মণের বাস ; তাঁদের কোন
প্রকার বিষয়-আশয় নেই, অথচ তাঁরা বেশ ভাল লোক, নীতি-
পরায়ণ। আর এইরূপ হবার কারণ এই যে, বাল্যকাল থেকেই
তাঁরা শিক্ষা পেয়ে আসছেন যে, তাঁরা বিধিনিষেধের অতীত,
তাঁদের কোন প্রকার শাস্তির বিধান নেই। তাঁরা নিজেদের দ্বিজ
বা ঈশ্বরতনয়র জ্ঞান করে থাকেন।

২৮শে জুলাই, রবিবার। (দস্তাবেজ-কৃত অবধূত-গীতা)

“মনের স্থিরতার উপর সমুদয় জ্ঞান নির্ভর করছে।”

“যিনি সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চে পূর্ণভাবে বিরাজ করছেন, যিনি আত্মার মধ্যে আত্ম-স্বরূপ, তাঁকে আমি নমস্কার করি কিরূপে ?”

“আত্মাকে আমার নিজের স্বভাব, নিজের স্বরূপ বলে জানাই পূর্ণজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষানুভূতি। আমিই তিনি, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই।”

“কোন চিন্তা, কোন বাক্য বা কোন কার্যই আমার বন্ধন উৎপাদন করতে পারে না। আমি ইন্দ্রিয়াতীত, আমি চিদানন্দস্বরূপ।”

অস্তি নাস্তি কিছুই নেই, সবই আত্ম-স্বরূপ। সমুদয় আপেক্ষিক ভাব, সমুদয় হৃন্দ দূর করে দাও, সব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেল, জাতি, কুল, দেবতা, আর যা কিছু, সব চলে যাক। থাক, হওয়া—এ সবের কথা কেন বল? দ্বৈত অদ্বৈত এ সমুদয় কথা ছেড়ে দাও। তুমি দুই ছিলে কবে, যে দ্বৈত ও অদ্বৈতের কথা বলছ? এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ব্রহ্মমাত্র, তিনি ছাড়া আর কিছু নয়। যোগের দ্বারা বিগুন্নি লাভ হবে, একথা বলো না—তুমি স্বয়ং যে শুদ্ধ-স্বভাব। তোমার কেউ শিক্ষা দিতে পারে না।

যিনি এই গীতা লিখেছেন, তাঁর মত লোকই ধর্মটাকে জীবন্ত রেখেছেন। তাঁরা বাস্তবিকই সেই ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করেছেন। তাঁরা কোন কিছুর তোয়াক্কা রাখেন না, শরীরের সুখঃখ গ্রাহ্য

করেন না, শীত উষ্ণ বা বিপদাপদ্ বা অন্য কিছু মোটেই গ্রাহ করেন না। জলন্ত অঙ্গার তাঁদের দেহকে দগ্ধ করতে থাকলেও তাঁরা স্থির হয়ে বসে আত্মানন্দ সম্ভোগ করেন, তাঁদের গা যে পুড়েছে, তা তাঁরা টেরই পান না।

“জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ ত্রিবিধ বন্ধন যখন দূর হয়ে যায়, তখনই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়।”

“যখন বন্ধন ও মুক্তিরূপ ভ্রম চলে যায়, তখনই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়।”

“মনঃসংযম করে থাক, তাতেই বা কি, না করে থাক, তাতেই বা কি? তোমার অর্থ থাকে, তাতেই বা কি, না থাকে তাতেই বা কি? তুমি নিত্যশুদ্ধ আত্মা। বল, আমি আত্মা, কোন বন্ধন কখনও আমার কাছে ঘেঁসতে পারেনি। আমি অপরিণামী নিশ্চল আকাশস্বরূপ; নানাবিধ বিশ্বাস বা ধারণারূপ মেঘ আমার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু আমাকে তারা স্পর্শই করতে পারে না।”

“ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য উভয়কেই দগ্ধ করে ফেল। মুক্তি ছেলে-মানুষী কথামাত্র। আমি সেই অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ, আমি সেই শুদ্ধিস্বরূপ।”

“কেউ কখন বদ্ধ হয়নি, কেউ কখন মুক্তও হয়নি। আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি অনন্তস্বরূপ, নিত্যমুক্তস্বভাব। আমাকে আর শেখাতে এসো না—আমি চিৎস্বভাব, কিসে আমার এই স্বভাব বদলাতে পারে? গুরুই বা কে? শিষ্যই বা কে?”

তর্কযুক্তি, জ্ঞানবিচার ছুড়ে আস্তাকুড়ে ফেলে দাও।

“বন্ধুত্বভাব লোকই অপরকে বন্ধ দেখে, ব্রাহ্ম ব্যক্তিই অপরকে ব্রাহ্ম দেখে, অশুভ্রুত্বভাব লোকই অপরের অশুভ্রু ভাব দেখে থাকে।”

দেশকালনিমিত্ত—এ সবই ভ্রম। তুমি যে মনে করছ তুমি বন্ধ আছ, মুক্ত হবে এটা তোমার রোগ। তুমি অপরিণামী। কথা বন্ধ কর, চূপ করে বসে থাক—সব জিনিস তোমার সামনে থেকে উড়ে যাক—ওগুলি স্বপ্নমাত্র। পার্থক্য বা ভেদ বলে কোন কিছু নেই, ওসব কুসংস্কার মাত্র। অতএব মৌনভাব অবলম্বন কর, আর নিজের স্বরূপ অবগত হও।

“আমি আনন্দঘনস্বরূপ।” কোন আদর্শের অনুসরণ করবার দরকার নেই—তুমি ছাড়া আর কি আছে? কিছুতে ভয় পেয়ো না। তুমি সার সত্তাস্বরূপ। শান্তিতে থাক—নিজেকে চঞ্চল করো না। তুমি কখনও বন্ধ হওনি। পুণ্য বা পাপ তোমাকে স্পর্শ করেনি। এই সমস্ত ভ্রম দূর করে দিয়ে শান্তিতে থাক। কাকে উপাসনা করবে? কেই বা উপাসনা করে? সবই ত আত্মা। কোন কথা কওয়া, কোনরূপ চিন্তা করাই কুসংস্কার। পুনঃ পুনঃ বল ‘আমি আত্মা’, ‘আমি আত্মা’। আর সব উড়ে যাক।

২৯শে জুলাই, সোমবার, প্রাতঃকাল

আমরা কখন কখন, কোন জিনিসের লক্ষণ করতে হলে, তার আশপাশের কতকগুলি ব্যাপার বর্ণনা করে থাকি। একে তটস্থ লক্ষণ বলে। আমরা যখন ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ নামে

অভিহিত করি, প্রকৃতপক্ষে আমরা তখন সেই অনির্বাচ্য সর্বাঙ্গীত সত্তারূপ সমুদ্রের কিনারায় কিছু কিছু বর্ণনা করছি মাত্র। আমরা একে 'অস্তিত্ব'-স্বরূপ বলতে পারি না, কারণ, অস্তিত্ব বলতে গেলেই তাঁর বিপরীত 'নাস্তিত্ব'র জ্ঞানও হয়ে থাকে, সুতরাং তাও আপেক্ষিক। তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা, কোন প্রকার কল্পনা, ঠিক ঠিক হতে পারে না। কেবল 'নেতি' 'নেতি'—এ নয়, ও নয় এই বলেই তাঁকে বর্ণনা করা যেতে পারে, কারণ, তাঁকে চিন্তা করতে গেলেও সীমাবদ্ধ করতে হয়—সুতরাং সেটা আর ব্রহ্মের যথার্থ ভাব হল না।

ইন্দ্রিয়গুলো দিবারাত্র তোমায় ভুলজ্ঞান এনে দিয়ে প্রতারণিত করছে। বেদান্ত অনেককাল পূর্বেই এই বিষয় আবিষ্কার করেন। আধুনিক বিজ্ঞান সবে মাত্র ঐ তত্ত্বটি বুঝতে আরম্ভ করেছে। একখানা ছবির প্রকৃতপক্ষে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে। কিন্তু চিত্রকর ছবিখানাতে কৃত্রিমভাবে গভীরতার ভাব ফলিয়ে প্রকৃতির প্রতারণার অনুকরণ করে থাকেন। দুজন লোক কখনও এক জগৎ দেখে না। চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ হলে তুমি দেখতে পাবে—কোন বস্তুতে কোন প্রকার গতি, কোন প্রকার পরিণাম নেই। কোন প্রকার গতি বা পরিণাম আছে, আমাদের এই ধারণাই মায়া। সমুদ্র প্রকৃতিটা অর্থাৎ সমুদ্র গতির তত্ত্বটাকে সমষ্টিভাবে আলোচনা কর। দেখ ও মন কেহই আমাদের যথার্থ আত্মা নয়—উভয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত; কিন্তু কালে আমরা এদের ভিতরের সার সত্য—যথার্থ তত্ত্বকে জানতে পারি। তখন আমরা দেহমনের পারে চলে যাই, সুতরাং

দেহমনের দ্বারা যা কিছু অনুভব হয়, তাও চলে যায়। যখন তুমি এই জগৎপ্রপঞ্চকে দেখতে পাবে না, বা জানতে পারবে না, তখনই তোমার আত্মোপলব্ধি হবে। আমাদের বাস্তবিক প্রয়োজন এই দ্বৈত বা আপেক্ষিক জ্ঞানকে অতিক্রম করা। অনন্ত মন বা অনন্ত জ্ঞান বলে কিছুই নেই, কারণ মন ও জ্ঞান উভয়ই সসীম। আমরা এক্ষণে আবরণের মধ্য দিয়ে দেখছি— তারপর ক্রমশঃ আবরণকে অতিক্রম করে আমরা আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সার সত্যস্বরূপ সেই অজ্ঞাত বস্তুর কাছে পৌঁছব।

যদি আমরা একটা কার্ডবোর্ডের ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একখানা ছবি দেখি, তা হলে আমরা ঐ ছবির সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা লাভ করি, কিন্তু তথাপি আমরা যা দেখি, তা বাস্তবিক ছবিটাই। ছিদ্রটা আমরা যত বাড়াতে থাকি, ততই আমরা ছবিটার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে থাকি। আমাদের নামরূপের ভ্রমাত্মক উপলব্ধি অনুসারে আমরা সত্য জিনিসটারই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা করে থাকি। আবার যখন আমরা কার্ডবোর্ডখানা ফেলে দিই, আমরা সেই একই ছবি দেখে থাকি। কিন্তু ছবিটাকে ঠিক ঠিক দেখতে পাই। আমরা ঐ ছবিটাতে যত বিভিন্ন প্রকার গুণ বা ভ্রমাত্মক ধারণা আরোপ করি না কেন, ছবিটার তাৎপর্য কিছু পরিবর্তন হয় না। এইরূপ আত্মাই সকল বস্তুর মূল সত্যস্বরূপ—আমরা যা কিছু দেখছি সবই আত্মা, কিন্তু আমরা যে ভাবে এদের নামরূপাকারে দেখছি, সে ভাবে নয়। ঐ নামরূপ আবরণের অন্তর্গত—মায়ার অন্তর্গত।

ঐগুলি যেন দুরবীনের কাচের উপরের দাগ; আবার যেমন

সূর্যের আলোকের দ্বারাই আমরা ঐ দাগগুলি দেখতে পাই, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সত্য বস্তু পশ্চাতে না থাকলে আমরা মায়াটাকেও দেখতে পেতাম না। স্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষটা ঐ ছরবীনের কাচের উপরকার দাগ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমি সত্যস্বরূপ অপরিণামী আত্মা, আর কেবল সেই সত্য বস্তুটাই আমাকে—স্বামী বিবেকানন্দকে—দেখতে সমর্থ করেছে। সকল ভ্রমের মূলীভূত সার সত্তা আত্মা—আর যেমন সূর্য কখন ঐ কাচের উপরের দাগগুলির সঙ্গে মিশিয়ে যায় না, আমাদের দাগগুলি দেখিয়ে দেয় মাত্র, সেইরূপ আত্মাও কখনও নামরূপের সঙ্গে মিশিয়ে যান না। আমাদের শুভ ও অশুভ কর্মসমূহ ঐ দাগগুলিকে যথাক্রমে কমায় বাড়ায় মাত্র, কিন্তু তারা আমাদের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মনের দাগগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে ফেল। তা হলেই আমরা দেখবো—‘আমি ও আমার পিতা এক’।

আমরা আগে প্রত্যক্ষানুভূতি করি, যুক্তিবিচার পরে এসে থাকে। আমাদের এই প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করতে হবে, আর এই হল বাস্তবিক ধর্ম। কোন ব্যক্তি শাস্ত্র, বিভিন্ন ধর্মমত বা অবতারের কথা না শুনে থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি প্রত্যক্ষানুভূতি করে থাকে তার আর কিছুর দরকার নেই। চিন্তা শুদ্ধ কর—ধর্মের এই হচ্ছে সার কথা, আর আমরা নিজেরা যতক্ষণ না মনের ঐ দাগগুলো দূর করছি, ততক্ষণ আমরা সেই সত্যস্বরূপকে ঠিক ঠিক দর্শন করতে পারি না। শিশু জগতের ভিতর কোন পাপ দেখতে পায় না, কারণ, বাইরের পাপটার

পরিমাণ নির্ণয় করবার কোন মাপকাঠি তার নিজের ভিতর নেই। তোমার ভিতর যে দোষগুলি আছে, সব দূর করে ফেল—তা হলেই তুমি আর বাইরে কোন দোষ দেখতে পাবে না। ছোট ছেলের সামনে ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে, সে তা খেয়ালই করে না—এটা তার কাছে কিছু একটা অজ্ঞান বলে বোধ হয় না। বাঁধার ছবির ভিতর লুকোনো জিনিসটা একবার যদি দেখতে পাও, তুমি পরে সৰ্বদাই তা দেখতে পাবে। এইরূপে যখন তুমি একবার মুক্ত ও নির্দোষ হয়ে যাবে, তখন জগৎপ্রপঞ্চের ভিতর তুমি মুক্তি ও শুদ্ধতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। সেই মুহূর্তেই হৃদয়ের গ্রন্থি সব ছিন্ন হয়ে যায়, সব বাঁকাচোরা জায়গা সিধা হয়ে যায়, আর এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নের আয় উড়ে যায়। আর ঘুম ভাঙলেই, আমরা এই সব বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম ভেবেই আশ্চর্য্য হই।

‘যাঁকে লাভ করলে পরিতাপমাণ দুঃখও হৃদয়কে বিচলিত করতে পারে না,’ তাঁকে লাভ করতে হবে।

জ্ঞানকুঠার দ্বারা দেহমনরূপ চক্রদ্বয়কে পৃথক করে ফেল—তা হলেই আত্মা মুক্তস্বরূপ হয়ে পৃথকভাবে দাঁড়াতে পারবে—যদিও পুরাতন বেগে তখনও দেহমনরূপ-চক্র ধানিকক্ষণের জন্ত চলবে। তবে তখন চাকাটি সোজাই চলবে, অর্থাৎ এই দেহমনের দ্বারা শুভকার্য্যই হবে। যদি সেই শরীরের দ্বারা কিছু মন্দ কার্য্য হয়, তা হলে জেনো, সে ব্যক্তি জীবমুক্ত নয়—যদি সে আপনাকে জীবমুক্ত বলে দাবি করে, তবে সে মিথ্যা কথা বলছে। এটাও বুঝতে হবে যে,

যখন চিত্তশুদ্ধির দ্বারা চক্রের বেশ সরল গতি এসে গেছে, সেই সময়ই তার উপর কুঠার প্রয়োগ সম্ভব। সকল শুদ্ধিকর কণ্ঠই অজ্ঞানকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নষ্ট করছে। অপরকে পাপী বলার চেয়ে আর মন্দ কার্য কিছু নেই। ভাল কাজ না জেনে করলেও তার ফল একই প্রকার হয়—তা বন্ধন-মোচনের সহায়তা করে।

ছরবীনের কাচের দাগগুলি দেখে সূর্য্যকেও দাগযুক্ত মনে করাই আমাদের মুখ্য ভ্রম। সেই 'আমি'-রূপ সূর্য্য কোন প্রকার বাহ্য-দোষে লিপ্ত নন—এইটি জেনে রাখ, আর নিজেকে ঐ দাগগুলি তুলতে নিযুক্ত কর। মানুষের চেয়ে বড় প্রাণী আর কেউ নেই। কৃষ্ণ, বৃদ্ধ ও শ্রীষ্টের দ্বারা মনুষ্যের উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। তোমার যা কিছু অভাব বোধ হয়, তাই তুমি সৃষ্টি করে থাক—বাসনামুক্ত হও। “বাসনায় জগৎ সৃজন, কর জীব বাসনা বর্জন।”

* * * *

দেবতারা ও পরলোকগত ব্যক্তির সকলে এখানেই রয়েছেন— এই জগৎকেই তাঁরা স্বর্গ বলে দেখছেন। একই অজ্ঞাত বস্তুকে সকলে নিজ নিজ মনের ভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছে। এই পৃথিবীতে কিন্তু ঐ অজ্ঞাত বস্তুর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট দর্শনলাভ হতে পারে। কখনও স্বর্গে যাবার ইচ্ছা করো না—এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ভ্রম। এই পৃথিবীতেও খুব বেশী পয়সা থাকা ও ঘোর দারিদ্র্য, উভয়ই বন্ধন—উভয়ই আমাদেরকে ধর্ম্মপথ থেকে—মুক্তি-পথ থেকে দূরে রাখে।

তিনটি জিনিস এ পৃথিবীতে বড় ছলভ—প্রথম, মনুষ্যদেহ (মনুষ্যরূপেই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট প্রতিবিম্ব বিদ্যমান ;—বাইবেলে আছে, “মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিরূপ”)। দ্বিতীয়, মুক্ত হবার জন্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তৃতীয়, মহাপুরুষের আশ্রয়-লাভ—যিনি স্বয়ং মারা-মোহ-সমুদ্র পার হয়ে গেছেন, এমন মহাত্মাকে গুরুরূপে লাভ।* এই তিনটি যদি পেয়ে থাক, তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, তুমি মুক্ত হবেই হবে।

কেবল তর্কযুক্তির দ্বারা তোমার যে সত্যের জ্ঞানলাভ হয়, তা একটা নূতন যুক্তিতর্কের দ্বারা উড়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি যা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অনুভব কর, তা তোমার কোনকালে যাবার নয়। ধর্মসম্বন্ধে কেবল বচনবাণীশ হলে কিছু ফল হয় না। যে কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসবে—যেমন মানুষ, জানোয়ার, আহাৰ, কাজকর্ম—সকলের পশ্চাতে ব্রহ্মদৃষ্টি কর—আর এইরূপ সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি করাকে একটা অভ্যাসে পরিণত কর।

(আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী) ইঙ্গারসোল আমার একবার বলেন,—“এই জগৎটা থেকে যতদূর লাভ করা যেতে পারে, তার চেষ্ঠা সকলের করা উচিত—এই আমার বিশ্বাস। কমলা লেবুটাকে নিংড়ে যতটা সম্ভব রস বার করে নিঃসৃত হবে—যেন এক ফোঁটা রসও বাদ না যায়—কারণ, আমরা এই জগৎ ছাড়া অপর কোন জগতের অস্তিত্বসম্বন্ধে সুনিশ্চিত নই।” আমি

* “ছলভঃ ত্রয়মৈবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।

মনুষ্যাত্মঃ মনুষ্যত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।” ৩ —বিবেকচূড়ামণি।

তাঁকে উত্তর দিয়েছিলাম—“আমি আপনার চেয়ে এই জগৎরূপ কমলা লেবুটাকে নিংড়াবার উৎকৃষ্টতর প্রণালী জানি—আর আমি এ থেকে বেশী রস পেয়ে থাকি। আমি জানি, আমার মৃত্যু নেই, সুতরাং আমার ঐ রস নিংড়ে নেবার তাড়া নেই। আমি জানি, ভয়ের কোন কারণ নেই—সুতরাং বেশ করে ধীরে ধীরে আনন্দ করে নিংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার স্ত্রীপুত্রাদি ও বিষয়সম্পত্তির কোন বন্ধন নেই, আমি সকল নরনারীকে ভালবাসতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষকে ভগবান বলে ভালবাসলে কি আনন্দ—একবার ভেবে দেখুন দেখি! কমলা লেবুটাকে এইভাবে নিংড়ান দেখি—অন্যভাবে নিংড়ে যা রস পেতেন, তার চেয়ে দশ হাজার গুণ রস পাবেন—এক ফোঁটাও বাদ যাবে না।”

যাকে আমাদের ‘ইচ্ছা’ বলে মনে হচ্ছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তরালস্থ আত্মা, এবং বাস্তবিকই মুক্তস্বভাব।

সোমবার, অপরাহ্ন

যীশুখ্রীষ্ট অসম্পূর্ণ ছিলেন, কারণ তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তদনুসারে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করেন নি, আর সর্বোপরি, তিনি নারীগণকে পুরুষের তুল্যাধিকার দেন নি। স্ত্রীলোকেরাই তাঁর জন্ত সব করলে, কিন্তু তিনি য়াহুদীদের দেশাচার দ্বারা এতদূর বদ্ধ ছিলেন যে, একজন নারীকেও তিনি ‘প্রেরিত শিষ্য’ (Apostle) পদে উন্নীত করেন নাই। তথাপি উচ্চতম চরিত্র হিসাবে বুদ্ধের পরেই তাঁর স্থান—আবার বুদ্ধও যে

একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত ছিলেন, তাও নয়। যাই হক, বুদ্ধ ধর্মরাজ্যে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সমাধিকার স্বীকার করেছিলেন, আর তাঁর নিজের স্ত্রীই তাঁর প্রথম ও একজন প্রধান শিষ্যা। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অধিনায়িকা হয়েছিলেন। আমাদের কিন্তু এই সকল মহাপুরুষদের দোষানুসন্ধান করা উচিত নয়, আমাদের শুধু তাঁদের আমাদের চেয়ে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞান করা উচিত। তা হলেও কিন্তু যিনি যত বড়ই হন না কেন, কোন মানুষকেই আমাদের শুধু বিশ্বাস করে পড়ে থাকলে চলবে না, আমাদেরও বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট হতে হবে।

কোন ব্যক্তিকেই তার দোষ বা অসম্পূর্ণতা দেখে বিচার করা উচিত নয়। মানুষের যে মহা মহা সদগুণ দেখা যায়, তা তার নিজের, কিন্তু তার দোষগুলি মনুষ্যজাতির সাধারণ দুর্বলতা মাত্র; সুতরাং তার চরিত্র বিচার করতে গেলে সেগুলি কখন গণনা করতে নেই।

* * * *

ইংরাজী ভাচুঁ (ধর্ম) শব্দটি সংস্কৃত 'বীর' শব্দ থেকে এসেছে; কারণ প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদেরই লোকে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক লোক বলে বিবেচনা করত।

৩০শে জুলাই, মঙ্গলবার

খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ প্রভৃতি এঁরা কেবল বহিরবলদ্বন্দ্বনস্বরূপ। আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিশুলোকে ঐ সকল আলদ্বনে আমরা আরোপ করে থাকি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরাই আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকি।

যীশু যদি না জন্মান্তেন, তবে মনুষ্যজাতির কখন উদ্ধার হত না,—এরূপ ভাবা ঘোর নাস্তিকতা। মনুষ্যস্বভাবের ভিতর যে ঐশ্বরিক ভাব অন্তর্নিহিত রয়েছে, তাকে ঐরূপে ভুলে যাওয়া বড় ভয়ানক—ঐ ঐশ্বরিক ভাব কোন না কোন সময়ে প্রকাশ হবেই হবে। মনুষ্যস্বভাবের মহত্ব কখনও ভুলো না। ভূত বা ভবিষ্যতে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর আর কেউ হন নি, হবেনও না। আমিই সেই অনন্ত মহাসমুদ্র—গ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তারই তরঙ্গ মাত্র। তোমার নিজের পরমাত্মা ব্যতীত আর কারও কাছে মাথা নুইও না। যতক্ষণ না তুমি আপনাকে সেই দেবদেব বলে জানতে পার্ছ, ততক্ষণ তোমার কখন মুক্তি হতে পারে না।

আমাদের সকল অতীত কস্মই বাস্তবিক ভাল, কারণ, আমাদের যা চরমাবস্থা হবে, ঐ কস্মগুলিই আমাদের সেইখানে নিয়ে যায়। কার কাছে আমি ভিক্ষা করব?—আমিই যথার্থ সত্তা, আর যা কিছু আমার স্বরূপ থেকে বিভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, তা স্বপ্নমাত্র। আমি সমগ্র সমুদ্র—তুমি নিজে ঐ সমুদ্রে যে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি করেছ, তাকে 'আমি' বুলো না। সেটা ঐ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে জেনো। সত্যকাম (অর্থাৎ সত্যলাভের জগু যার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়েছে) শুনতে পেলেন—তার হৃদয়াভ্যন্তরীণ বাণী তাঁকে বলছে, "তুমি অনন্তস্বরূপ, সেই সর্বব্যাপী সত্তা তোমার ভিতরে রয়েছে। নিজেকে সংযত কর, আর তোমার যথার্থ আত্মার বাণী শোন।"

যে সকল মহাপুরুষ প্রচারকার্যের জগু প্রাণপাত করে

যান তাঁরা, যে সকল মহাপুরুষ নির্জনে নীরবে মহাপবিত্র
 জীবন যাপন করেন এবং বড় বড় ভাব চিন্তা করে যান ও
 ঐরূপে জগতের সাহায্য করেন, তাঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত
 অসম্পূর্ণ। ঐ সকল শান্তিপ্ৰিয় নির্জনবাসী মহাপুরুষের একের
 পর অপরের আবির্ভাব হয়—শেষে তাঁদের শক্তিরই চরমফলস্বরূপ
 এমন এক শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি সেই তত্ত্বগুলি
 চারিদিকে প্রচার করে বেড়ান।

* * * *

জ্ঞান স্বতঃই বর্তমান রয়েছে, মানুষ কেবল সেটা আবিষ্কার
 করে মাত্র। বেদসমূহই এই চিরন্তন জ্ঞান—যার সহায়তায় ঈশ্বর
 এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ভারতের দার্শনিকগণ উচ্চতম দার্শনিক
 তত্ত্ব বলে থাকেন, আর এই ভয়ানক দাবিও করে থাকেন।

* * * *

সত্য যা, তা সাহসপূর্বক নির্ভীকভাবে লোকের কাছে
 বল—ঐ সত্যপ্রকাশের জন্ত ব্যক্তিবিশেষের কষ্ট হল বা না
 হল, সে দিকে খেয়াল করো না। সত্যের জ্যোতিঃ বুদ্ধিমান
 লোকদের পক্ষেও যদি অতিমাত্রায় প্রথর বোধ হয়, তাঁরা
 যদি তা সহ করতে না পারেন, সত্যের বজ্রায় যদি তাঁদের
 ভাসিয়ে নিয়ে যায় তা যাক—যত শীঘ্র যার, ততই ভাল।
 ছেলেমানুষী ভাব সব শিশুদের ও বুনো অসভ্যদেরই শোভা
 পায়; কিন্তু দেখা যায়, ঐ সব ভাব কেবল শিশুমহলে বা জঙ্গলেই
 আবদ্ধ নয়, ঐ সকল ভাবের অনেকগুলি ধর্মপ্রচারকের আসনেও
 উঠেছে।

বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হলে আর সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা অত্যায়া। ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে দেহপাত কর।

উন্নতি যা কিছু তা এই ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক জগতেই হয়ে থাকে। মানবদেহই সর্বশ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই সর্বোচ্চ প্রাণী, কারণ, এই মানবদেহে এই জন্মেই আমরা এই আপেক্ষিক জগতের সম্পূর্ণরূপে বাইরে যেতে পারি, সত্য সত্যই মুক্তির অবস্থা লাভ করতে পারি, আর ঐ মুক্তিকে আমাদের চরম লক্ষ্য। শুধু যে আমরা পারি তা নয়, অনেকে সত্য সত্যই ইহজীবনে মুক্তাবস্থা লাভ করেছেন, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং কেউ এ দেহ ত্যাগ করে যতই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতর দেহ লাভ করুক, সে তখনও এই আপেক্ষিক জগতের ভিতরই রয়েছে, সে আর আমাদের চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে না, কারণ, মুক্তিলাভ করা ছাড়া আর কি উচ্চাবস্থা লাভ করা যেতে পারে।

দেবতারা (angels) কখনও কোন অত্যায়া কাজ করেন না, তাঁরা কাজেই শাস্তিও পান না; সুতরাং তাঁরা মুক্ত হতেও পারেন না। সংসারের ধাক্কাতেই আমাদের জাগিয়ে দেয়, তাইতেই এই জগৎস্বপ্ন ভাঙ্গবার সাহায্য করে। ঐরূপ ক্রমাগত আঘাতেই এই জগতের অসম্পূর্ণতা বুঝিয়ে দেয়, তাইতে আমাদের এ সংসার থেকে পালানোর—মুক্তিলাভ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়।

কোন বস্তু যখন আমরা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি, তখন

আমরা তার এক নাম দিই, আবার সেই জিনিসকেই যখন আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন অন্য নাম দিই। আমাদের নৈতিক প্রকৃতি যত উন্নত হয়, আমাদের উপলব্ধিও তত উৎকৃষ্টতর হয়, আমাদের ইচ্ছাশক্তিও তত অধিক বলবতী হয়।

মঙ্গলবার, অপরাহ্ন

আমরা যে জড় ও চিন্তারাশির ভিতর সামঞ্জস্য দেখতে পাই, তার কারণ, উভয়ই এক অজ্ঞাত বস্তুর দুটি দিকমাত্র, সেই জিনিসটাই দুভাগ হয়ে বাহ্য ও আন্তর হয়েছে।

ইংরাজী 'প্যারাডাইস্' শব্দটি সংস্কৃত 'পরদেশ' শব্দ থেকে এসেছে, ঐ শব্দটা পারশ্ব ভাষায় চলে গিয়েছিল—এর শব্দার্থ হচ্ছে দেশের পারে, অথবা অন্য দেশ, বা অন্য লোক। প্রাচীন আর্থোরা বরাবরই আত্মায় বিশ্বাস করতেন, তাঁরা মানুষকে কেবল দেহমাত্র বলে কখনও ভাবতেন না। তাঁদের মতে স্বর্গ নরক উভয়ই সাস্তু, কারণ, কোন কার্যই কখনও তার কারণ-নাশের পর স্থায়ী হতে পারে না, আর কোন কারণই কখনও চিরস্থায়ী নয়; সুতরাং কার্য বা ফলমাত্রের নাশ হবেই। নিম্নকথিত উপাখ্যানটিতে সমগ্র বেদান্তদর্শনের সার রয়েছে—

সোনার পাখাওয়ালার দুটি পাখী একটা গাছে বসে আছে। উপরে যে পাখীটা বসে আছে, সে স্থির শাস্তভাবে নিজ মহিমায় নিজে বিভোর হয়ে রয়েছে; আর যে পাখীটা নীচের ডালে রয়েছে, সে সদাই চঞ্চল—ঐ গাছের ফল খাচ্ছে—কখনও মিষ্ট ফল, কখনও বা কটু ফল। একবার সে একটা অতিরিক্ত কটু

ফল খেলে, তখন সে একটু স্থির হয়ে উপরের সেই মহিমময় পাখীটার দিকে চাইলে। কিন্তু আবার সে নীচুই তাকে ভুলে গিয়ে পূর্বের মত সেই গাছের ফল খেতে লাগল। আবার সে একটা কটু ফল খেলে—এইবার সে টুপ্ টুপ্ করে লাফিয়ে উপরের পাখীটার হু এক ডাল কাছে গেল। এইরূপ অনেকবার হল, অবশেষে নীচের পাখীটা একেবারে উপরের পাখীটার জায়গায় গিয়ে বসল, আর নিজেকে হারিয়ে ফেললে। সে অমনি বুঝলে যে, দুটো পাখী কোন কালেই ছিল না, সে নিজেকেই বরাবর শান্ত, স্থিরভাবে নিজ মহিমায় নিজে মগ্ন, উপরের পাখীই ছিল।

৩১শে জুলাই, বুধবার

প্রটেষ্ট্যান্ট-ধর্ম-সংস্থাপক লুথার ধর্মসাধনের ভিতর থেকে সন্ন্যাস বা ত্যাগ বাদ দিয়ে তার স্থানে কেবল নীতিমাত্র প্রচার করে ধর্ম জিনিসটার সর্বনাশ করে গেলেন। নাস্তিক ও জড়বাদীরাও নীতিপরায়ণ হতে পারে, কেবল ঈশ্বরবিশ্বাসীরাই ধর্মলাভ করতে পারে।

মহাপুরুষদের পবিত্রতার মূল্য, সমাজ যাদের অসৎ বলে থাকে, তারা দিয়ে থাকে—সুতরাং তাদের দেখলে তাঁদের ঘৃণা না করে ঐ কথা ভাবা উচিত। যেমন গরীব লোকের পরিশ্রমের ফলে বড় লোকের বিলাসিতা সম্ভব হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। ভারতের সাধারণ লোকের যে এত অবনতি দেখা যায়, সেটা

মীরাবাই, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাদের উৎপাদনের জন্য যেন প্রকৃতিকে তার মূল্য ধরে দিতে হয়েছে। *

* * * * *

“আমিই পবিত্রাত্মা বা ধার্মিকদের পবিত্রতা বা ধর্মস্বরূপ।”
 “আমিই সকলের মূল বা বীজস্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাকে বিভিন্নপ্রকারে ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু সবই আমি।” “আমিই সব করছি, তুমি নিমিত্তমাত্র।”

বেশী বকো না, তোমার নিজের ভিতর যে আত্মা রয়েছেন তাঁকে অনুভব কর, তবেই তুমি জানী হবে। এই হল জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। জ্ঞান্‌বার বস্তু একমাত্র ব্রহ্ম, তিনিই সব।

* * * * *

সব মানুষকে সুখ ও জ্ঞানের অন্বেষণে বদ্ধ করে, রজঃ বাসনা দ্বারা বদ্ধ করে, তমঃ ভ্রমজ্ঞান, আলস্য প্রভৃতি দ্বারা বদ্ধ করে। রজঃ, তমঃ এই দুটি নিকৃষ্টগুণকে সত্বের দ্বারা জয় কর, তারপর সমুদয় ঈশ্বরে সমর্পণ করে মুক্ত হও।

* ভক্তিয়োগী অতি শীঘ্র ব্রহ্মোপলব্ধি করেন ও তিন গুণের পারে চলে যান।

* সমাজের আদর্শ অতি উচ্চ হইলে সকলে উহা পালন করিতে পারে না, কিন্তু এই অধিকাংশ লোক আদর্শ পালন করিতে গিয়া হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের সহায়তা ব্যতীত ঐ আদর্শটি বজায় থাকিতে পারে না। যেমন একশত সৈন্য শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল। তাহাদের মধ্যে আশী জন মৃত্যুমুখে পতিত হইল, অবশিষ্ট কুড়ি জন কৃতকার্য হইল। এখানে ঐ আশী জন সৈন্য ঐ বুদ্ধজয়ের মূল্য প্রদান করে নাই কি? সেইরূপ।

ইচ্ছা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়, বাসনা, রিপু—এইগুলি মিলে, আমরা যাকে জীবাত্মা বলে থাকি, তাই হয়েছে।

প্রথম, প্রাতিভাসিক আত্মা (দেহ) ; দ্বিতীয়, মানসাত্মা—যে দেহটাকে আমি বলে মনে করে ; তৃতীয়, যথার্থ আত্মা, যিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। তাঁকে আংশিকভাবে দেখলে প্রকৃতি বলে বোধ হয়, আবার তাঁকেই পূর্ণভাবে দেখলে সমস্ত প্রকৃতি উড়ে যায় ; এমন কি, তাঁর স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ হয়ে যায়। প্রথম—পরিণামী ও অনিত্য, দ্বিতীয়—প্রবাহরূপে নিত্য (প্রকৃতি), তৃতীয়—কূটস্থনিত্য (আত্মা)।

আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর, এই হল সর্বোচ্চ অবস্থা। আশা করবার কি আছে ? আশার বন্ধন ছিঁড়ে ফেল, নিজের আত্মার উপর দাঁড়াও, স্থির হও ; যাই কর, সব ভগবানে অর্পণ কর, কিন্তু তার ভিতর কোন কপটতা রেখো না।

ভারতের কারও কুশল জিজ্ঞাসা করতে 'স্বস্থ' (যা থেকে 'স্বাস্থ্য' কথাটা এসেছে) এই সংস্কৃত শব্দটার ব্যবহার হয়ে থাকে—স্বস্থ শব্দের অর্থ—স্ব অর্থাৎ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। হিন্দুরা কোন জিনিস দেখেছে, এইটা বুঝাতে হলে বলে থাকে, 'আমি একটা পদার্থ দেখেছি।' 'পদার্থ' কি না পদ বা শব্দের অর্থ অর্থাৎ শব্দ-প্রতিপাদ্য ভাববিশেষ। এমন কি, এই জগৎপ্রপঞ্চটা তাদের কাছে একটা 'পদার্থ' (অর্থাৎ পদের অর্থ)।

জীবগুস্ত পুরুষের দেহ আপনা আপনি শুভ কার্যাই করে

থাকে। সেটা কেবল শুভ কার্যই করতে পারে, কারণ, তা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেছে। যে অতীত সংস্কাররূপ বেগের দ্বারা তাঁদের দেহচক্র পরিচালিত হয়ে থাকে, তা সব শুভ সংস্কার। মন্দ সংস্কার সব দগ্ধ হয়ে গেছে।

* * * * *

“मदच्छात्रं कर्मानाम-रस-पीयूष-नर्ज्जितम् ।

तद्দিনं दुर्दिनं मन्त्रे मेघाच्छन्नं न दुर्दिनम् ॥”

—‘সেই দিনকেই যথার্থ দুর্দিন বলা যায়, যে দিন আমরা ভগবৎ-প্রসঙ্গ না করি; কিন্তু যে দিন মেঘ ঝড় বৃষ্টি হয়, সে দিনকে প্রকৃতপক্ষে দুর্দিন বলা যায় না।’

সেই পরম প্রভুর প্রতি ভালবাসাকে যথার্থ ভক্তি বলা যায়। অন্য কোন পুরুষের প্রতি ভালবাসাকে, তিনি যত বড়ই হন না কেন, ভক্তি বলা যায় না। এখানে পরম প্রভু বলতে পরমেশ্বরকে বুঝাচ্ছে। তোমরা পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বর (Personal God) বলতে যা বোঝ ভারতে পরমেশ্বরের ধারণা তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। “যাঁ হতে এই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হচ্ছে, যাঁতে এটা স্থির রয়েছে আবার প্রলয়কালে যাঁতে লয় হয়, তিনিই ঈশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ, সর্বশক্তিমান, সদামুক্তস্বভাব, দয়াময়, সর্বজ্ঞ, সকল গুরুর গুরু, অনির্বাচনীয় প্রেমস্বরূপ।”

মানুষ নিজের মস্তিষ্ক থেকে ভগবানকে সৃষ্টি করে না; তবে তার যতদূর শক্তি, সে সেইভাবে তাঁকে দেখতে পারে, আর তার যত সর্বোৎকৃষ্ট ধারণা, তাঁতে আরোপ করে। এই এক

একটি গুণই ঈশ্বরের সবটাই, আর এই এক একটি গুণের দ্বারা সবটাকে বোঝানই বাস্তবিক ব্যক্তিস্বরূপ-ঈশ্বরের (Personal God) দার্শনিক ব্যাখ্যা। ঈশ্বর নিরাকার, অথচ তাঁর সব আকার রয়েছে, তিনি নিগুণ আবার তাঁতে সব গুণ রয়েছে। আমরা যতক্ষণ মানবভাবাপন্ন রয়েছি, ততক্ষণ ঈশ্বর, প্রকৃতি ও জীব—এই তিনটি সত্তা আমাদের দেখতে হয়। তা না দেখে থাকতেই পারি না।

কিন্তু ভক্তের পক্ষে এই সকল দার্শনিক পার্থক্য কেবল বাজে কথা মাত্র। সে যুক্তি-বিচার মোটে গ্রাহ্যই করে না, সে বিচার করে না—সে দেখে, প্রত্যক্ষ অনুভব করে। সে ঈশ্বরের শুদ্ধ প্রেমে আত্মহারা হয়ে যেতে চায়; আর এমন অনেক ভক্ত হয়ে গেছেন, যারা বলেন, মুক্তির চেয়ে ঐ অবস্থাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যারা বলেন, “চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি”—আমি সেই প্রেমাস্পদকে ভালবাসতে চাই, তাঁকে সম্ভোগ করতে চাই।

ভক্তিয়োগে প্রথম বিশেষ প্রয়োজন এই যে, অকপটভাবে ও প্রবলভাবে ঈশ্বরের অভাব বোধ করা। আমরা ঈশ্বর ছাড়া আর সবই চাই, কারণ, বহির্জগত থেকেই আমাদের সব বাসনা পূরণ হয়ে থাকে। যতদিন আমাদের প্রয়োজন বা অভাববোধ জড়জগতের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন আমরা ঈশ্বরের জন্ম কোন অভাববোধ করি না; কিন্তু যখন আমরা এ জীবনে চারদিক থেকে প্রবল ঘা খেতে থাকি, আর ইহজগতের সকল বিষয়েই নিরাশ হই, তখনই উচ্চতর কোন বস্তুর

কিন্তু আমাদের প্রয়োজন বোধ হয়ে থাকে, তখনই আমরা ঈশ্বরের অশ্বেষণ করে থাকি।

ভক্তি আমাদের কোন বৃত্তিকে ভেঙ্গে চুরে দেয় না, বরং ভক্তিব্যোগের শিক্ষা এই যে, আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মুক্তিলাভ করবার উপায়স্বরূপ হতে পারে। ঐ সব বৃত্তিগুলিকেই ঈশ্বরানুভূতি করতে হবে—সাধারণতঃ যে ভালবাসা অনিত্য ইন্দ্রিয়বিষয়ে নষ্ট করা হয়ে থাকে, সেই ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে হবে।

তোমাদের পাশ্চাত্যধর্মের ধারণা হতে ভক্তির এইটুকু তফাৎ যে, ভক্তিতে ভয়ের স্থান নাই—ভক্তি দ্বারা কোন পুরুষের ক্রোধ শান্ত করতে বা কাউকে সন্তুষ্ট করতে হবে না। এমন কি, এমন সব ভক্তও আছেন, যারা ঈশ্বরকে তাঁদের নিজের ছেলে বলে উপাসনা করে থাকেন—এরূপ উপাসনার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ উপাসনায় ঔষ বা ভয়মিশ্র ভক্তির কোন ভাব না থাকে। প্রকৃত ভালবাসায় ভয় থাকতে পারে না, আর যতদিন পর্য্যন্ত এতটুকু ভয় থাকবে, ততদিন ভক্তির আরম্ভই হতে পারে না। আবার ভক্তিতে ভগবানের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার, অথবা তাঁর সঙ্গে কেনাবেচার ভাব কিছু নাই। ভগবানের কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা ভক্তের দৃষ্টিতে মহা অপরাধ। ভক্ত কখনও ভগবানের নিকট আরোগ্য বা ঐশ্বর্য্য, এমন কি স্বর্গ পর্য্যন্ত কামনা করেন না।

যিনি ভগবানকে ভালবাসতে চান, ভক্ত হতে চান, তাঁকে ঐ সব বাসনাগুলি একটি পুঁটুলি করে দরজার বাইরে ফেলে

দিয়ে ঢুকতে হবে। যিনি সেই জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করতে চান, তাঁকে এর দরজায় ঢুকতে গেলে আগে দোকানদারী-ধর্মের পুঁটুলি বাইরে ফেলে আসতে হবে। এ কথা বলছি না যে, ভগবানের কাছে যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না—সবই পাওয়া যায়, কিন্তু ঐরূপ প্রার্থনা করা অতি নীচ দরের ধর্ম, ভিখারীর ধর্ম।

‘উষিত্বা জাহুবীতীরে কৃপং খনতি হৃদয়তিঃ।’

—সে ব্যক্তি বাস্তবিকই মূর্খ, যে গঙ্গাতীরে বাস করে জলের জন্তু কুম্বা খোঁড়ে।

এই সব আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ঐহিক অভ্যুদয়ের জন্তু প্রার্থনাকে ভক্তি বলা যায় না—এগুলি অতি নীচ দরের কর্ম। ভক্তি এর চেয়ে উঁচু জিনিস। আমরা রাজরাজের সামনে আসবার চেষ্টা করছি। আমরা সেখানে ভিখারীর বেশে যেতে পারি না। যদি আমরা কোন মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত হতে ইচ্ছা করি, ভিখারীর মত ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে গেলে সেথায় কি ঢুকতে দেবে? কখনই নয়। দরওয়ান আমাদের ফটক থেকে বার করে দেবে। ভগবান্ রাজার রাজা—আমরা তাঁর সামনে কখনও ভিক্ষুকের বেশে যেতে পারি না। দোকানদারদের তথায় প্রবেশাধিকার নেই—সেখানে কেনাবেচা একেবারেই চলবে না। তোমরা বাইবেলেও পড়েছ, যীশু ক্রেতাবিক্রেতাদের মন্দির থেকে বার করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, ভক্ত হবার জন্তু আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, স্বর্গাদির কামনা একেবারে দূর করে দেওয়া। ঐরূপ

স্বর্গ এই জায়গারই, এই পৃথিবীরই মত—না হয় এর চেয়ে একটু ভাল। খ্রীষ্টিয়ানদের স্বর্গের ধারণা এই যে, সেটা একটা খুব বেশী ভোগের স্থানমাত্র—সেটা কি করে ভগবান হতে পারে? এই যে সব স্বর্গে যাবার বাসনা—এ ভোগস্বথেরই কামনা। এ বাসনা ত্যাগ করতে হবে। ভক্তের ভালবাসা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হওয়া চাই—নিজের জন্ম ইহলোকে বা পরলোকে কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করা হবে না।

সুখদুঃখ, লাভক্ষতি—এ সকলের গণনা ত্যাগ করে দিবারাত্রি ঈশ্বরোপাসনা কর—এক মুহূর্তও যেন বৃথা নষ্ট না হয়।

আর সব চিন্তা ত্যাগ করে দিবারাত্রি সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের উপাসনা কর।

এইরূপে দিবারাত্রি উপাসিত হলে তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাঁর উপাসকদিগকে তাঁর অনুভবে সমর্থ করেন।

১লা আগষ্ট, বৃহস্পতিবার

প্রকৃত গুরু তিনি, যিনি আমাদের আধ্যাত্মিক পূর্বপুরুষ—আমরা যার ভিতরের আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী। তিনিই সেই প্রণালী, যার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রবাহ আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়। তিনিই সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগস্থলস্বরূপ। ব্যক্তিবিশেষের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থেকে দুর্বলতা ও অন্তঃসারশূন্য বহিঃপূজা আসতে পারে, কিন্তু গুরুর প্রতি প্রবল অনুরাগে খুব দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হয়, তিনি আমাদের ভিতরের গুরুর সঙ্গে আমাদের

সংযোগবিধান করেন। যদি তোমার গুরুর ভিতর যথার্থ সত্য থাকে, তবে তাঁর আরাধনা কর, ঐ গুরুভক্তিই তোমাকে অতি সত্বর চরম অবস্থায় নিয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুর ন্যায় পবিত্রস্বভাব ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও টাকা ছোঁই নাই, আর তাঁর ভিতরে কাম একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় ধর্ম্যাচার্যাদের কাছে জড়বিজ্ঞান শিখতে যেও না, তাঁদের সমগ্র শক্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ভিতর মানুষভাবটা মরে গিচ্ছিল, কেবল ঈশ্বরত্ব অবশিষ্ট ছিল। তিনি বাস্তবিকই পাপ দেখতে পেতেন না—তিনি সত্য সত্যই যে চক্ষে বহির্জগতে পাপ দর্শন হয়, তার চেয়ে পবিত্রতর দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। এইরূপ অল্প কয়েকজন পরমহংসের পবিত্রতাই সমগ্র জগৎটাকে ধারণ করে রেখেছে। যদি এঁরা সকলেই মারা যান, সকলেই যদি জগৎটাকে ত্যাগ করে যান, তবে জগৎ খণ্ড খণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁরা কেবল নিজে মহোচ্চ পবিত্র জীবন যাপন করে লোকের কল্যাণবিধান করেন, কিন্তু তাঁরা যে অপরের কল্যাণ করছেন, তা তাঁরা টেরও পান না; তাঁরা নিজেরা আদর্শ জীবন যাপন করেই সন্তুষ্ট থাকেন।

* * * *

আমাদের ভিতরে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বর্তমান রয়েছে, শাস্ত্র তার আভাস দিয়ে থাকে, আর তাকে অভিব্যক্ত করবার উপায় বলে দেয়, কিন্তু যখন আমরা নিজেরা সেই জ্ঞান লাভ করি, তখনই

আমরা ঠিক ঠিক শাস্ত্র বুঝতে পারি। যখন তোমার ভিতর সেই অস্তর্জ্যোতির প্রকাশ হয়, তখন আর শাস্ত্রে কি প্রয়োজন?— তখন কেবল অস্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সমুদ্র শাস্ত্রে যা আছে, তোমার নিজের মধ্যেই তা আছে, বরং তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী আছে। নিজের উপর বিশ্বাস কখনও হারিও না, এ জগতে তুমি সব করতে পার। কখনও নিজেকে দুর্বল ভেবো না, সব শক্তি তোমার ভিতর রয়েছে।

প্রকৃত ধর্ম যদি শাস্ত্রের উপর বা কোন মহাপুরুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তবে চলোয় যাক্ সব ধর্ম, চলোয় যাক্ সব শাস্ত্র। ধর্ম আমাদের নিজের ভিতর রয়েছে। কোন শাস্ত্র বা কোন গুরু আমাদের তাঁকে লাভ করবার সাহায্য ভিন্ন আর কিছু করতে পারেন না; এমন কি এঁদের সহায়তা ছাড়াও আমাদের নিজের ভিতরেই সব সত্য লাভ করতে পারি। তথাপি শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন হও, কিন্তু এঁরা কেন তোমায় বন্ধ না করেন; তোমার গুরুকে ঈশ্বর বলে উপাসনা কর, কিন্তু অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ করো না। তাঁকে যতদূর সম্ভব ভালবাস, কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা কর। কোনরূপ অন্ধ বিশ্বাস তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, তুমি নিজের নিজের মুক্তিসাধন কর। ঈশ্বরসম্বন্ধে এই একমাত্র ধারণা রাখ যে, তিনি আমাদের নিত্য সহায়।

স্বাধীনতার ভাব এবং উচ্চতম প্রেম—দুইই একসঙ্গে থাকা চাই, তা হলে এদের মধ্যে কোনটাই আমাদের বন্ধনের কারণ হতে পারে না। আমরা ভগবানকে কিছু দিতে পারি না, তিনিই

আমাদের সব দিবে থাকেন। তিনি সকল গুরু গুরু। তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের যা যথার্থ স্বরূপ, তাই তিনি। যখন তিনি আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা, তখন আমরা যে তাকে ভালবাসব, এ আর আশ্চর্য্য কি? আর কাকে বা কোন্ বস্তুকে আমরা ভালবাসতে পারি? আমাদের 'দগ্ধেষ্ক-নমিবানলম্' হওয়া চাই। যখন তোমরা কেবল ব্রহ্মকেই দেখবে, তখন আর কার উপকার করতে পারবে? ভগবানের ত আর উপকার করতে পার না? তখন সব সংশয় চলে যায়, সর্বত্র সমতত্ত্ব এসে যায়। যদি তখন কারও কল্যাণ কর ত নিজেরই কল্যাণ করবে। এইটি অমূল্যব কর যে, দানগ্রহীতা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি যে তার সেবা করছ, তার কারণ—তুমি তার চেয়ে ছোট; এ নয় যে, তুমি বড়, আর সে ছোট। গোলাপ যেমন নিজের স্বভাবেই সুগন্ধ বিতরণ করে, আর সুগন্ধ দিচ্ছি বলে মোটেই টের পায় না, তুমিও সেই ভাবে দান কর।

সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দু সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি তাঁর সমুদয় জীবনটা ভারতের সাহায্যকল্পে অর্পণ করেছিলেন। তিনিই সতীদাহপ্রথা বন্ধ করেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, এই সংস্কারকার্য্য সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদের দ্বারা সাধিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। রাজা রামমোহন রায়ই এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং একে রহিত করবার জন্য গবর্নমেন্টের সহায়তালাভে কৃতকার্য্য হন। যতদিন না তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, ততদিন ইংরাজেরা কিছুই করেনি। তিনি ব্রাহ্মসমাজ নামে

বিখ্যাত ধর্মসমাজও স্থাপন করেন, আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা চাঁদা দেন। তিনি তারপর সরে এলেন এবং বললেন 'তোমরা আমাকে ছেড়ে নিজেরা এগিয়ে যাও।' তিনি নামমশ একদম চাইতেন না, নিজের জন্য কোনরূপ ফলাফল কল্পিতেন না।

বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ন

জগৎপ্রপঞ্চ অনন্তভাবে অভিব্যক্ত হয়ে ক্রমাগত চলেছে— যেন নাগরদোলা—আত্মা যেন ঐ নাগরদোলার চড়ে ঘুরছে। এক একজন লোক ঐ নাগরদোলা থেকে নেমে পড়ছে বটে, কিন্তু নাগরদোলার ঘোরবার বিরাম নেই, সেই একরকম ঘটনাই পুনঃ পুনঃ হচ্ছে, আর এই কারণেই লোকের ভূতভবিষ্যৎ সব বলে দেওয়া যেতে পারে; কারণ, প্রকৃতপক্ষে সবই বর্তমান। যখন আত্মা একটা শৃঙ্খলের ভিতর এসে পড়ে, তখন তাকে সেই শৃঙ্খলের যা কিছু অনুভব বা ভোগ—সবই গ্রহণ করতে হয়। ঐরূপ একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণী থেকে আত্মা আর একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণীতে চলে যায়, আর কোন কোন শ্রেণীতে এলে তারা আপনাদের ব্রহ্মরূপ অনুভব করে একেবারে তা থেকে বেরিয়ে যায়। ঐরূপ শ্রেণী বা শৃঙ্খলবিশেষের একটি স্থান ঘটনাকে অবলম্বন করে সমুদয় শৃঙ্খলটাকেই টেনে আনা যেতে পারে, আর তার ভিতরের সমুদয় ঘটনাটাই যথাযথ পাঠ করা যেতে পারে। এই শক্তি সহজেই লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু এতে বাস্তবিক কোন লাভ নেই, আর যত ঐ শক্তি লাভের চেষ্টা করা যায়, ততই আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার হানি

হয়। স্মৃতরাং ওসব বিষয়ের চেষ্টা করো না, ভগবানের উপাসনা কর।

২রা আগষ্ট, শুক্রবার

ভগবৎসাক্ষাৎকার করতে গেলে প্রথমে নিষ্ঠার দরকার।

‘সব্‌সে বসিয়ে সব্‌সে বসিয়ে সব্‌কা লীজিয়ে নাম।

হাঁজী হাঁজী করতে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম ॥’

—সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের সঙ্গে বস, সকলের নাম লও, অপরের কথায় হাঁ হাঁ করতে থাক, কিন্তু আপন ভাব কোন মতে ছেড়ো না। এর চেয়ে উচ্চতর অবস্থা—অপরের ভাবে নিজেকে যথার্থ ভাবিত করা। যদি আমিই সব হই, তবে আমার ভাইয়ের সঙ্গে যথার্থভাবে এবং কার্যতঃ সহানুভূতি করতে পারব না কেন? যতক্ষণ আমি দুর্বল, ততক্ষণ আমাকে নিষ্ঠা করে একটা রাস্তা ধরে থাকতে হবে; কিন্তু যখন আমি সবল হব, তখন আমি অপর সকলের মত অনুভব করতে পারব, তাদের সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি করতে পারব।

প্রাচীন কালের লোকের ভাব ছিল—‘অপর সকল ভাব নষ্ট করে একটা ভাবকে প্রবল কর।’ আধুনিক ভাব হচ্ছে—‘সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি কর।’ একটা তৃতীয় পন্থা হচ্ছে—‘মনের বিকাশ কর ও তাকে সংযত কর,’ তারপর যেখানে ইচ্ছা তাকে প্রয়োগ কর—তাতে ফল খুব শীঘ্র হবে। এইটি হচ্ছে যথার্থ আত্মোন্নতির উপায়। একাগ্রতা শিখা কর, আর যে দিকে ইচ্ছা তার প্রয়োগ কর। এরূপ করলে তোমার কিছুই খোঁসাতে

হবে না। যে সমস্তটাকে পায়, সে অংশটাকেও পায়। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত।

“আমি প্রথমে তাকে দেখলাম, সেও আমার দেখলে, আমিও তার প্রতি কটাক্ষ করলাম, সেও আমার প্রতি কটাক্ষ করলে”— এইরূপ চলতে লাগল—শেষে ছুটি আত্মা এমন সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে গেল যে, তারা প্রকৃতপক্ষে এক হয়ে গেল।

ছরকম সমাধি আছে—এক রকম হচ্ছে সবিকল্প—এতে একটু দ্বৈতের আভাস থাকে। আর এক রকম হচ্ছে নির্বিকল্প—ধ্যানের দ্বারা জ্ঞাতা-জ্ঞের অভেদ হয়ে যায়।

প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে তোমাকে সহানুভূতি-সম্পন্ন হতে শিখা করতে হবে, তারপর একেবারে উচ্চতম অদ্বৈতভাবে লাফিয়ে যেতে হবে। নিজের সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা লাভ করে তারপর ইচ্ছা করলে আপনাকে আবার সীমাবদ্ধ করতে পার। প্রত্যেক কাজে নিজের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর। ধ্যানিকরণের জগৎ অদ্বৈতভাব ভুলে দ্বৈতবাদী হবার শক্তি লাভ করতে হবে, আবার যখন খুসি যেন ঐ অদ্বৈতভাব আশ্রয় করতে পারা যায়।

* * * * *

কার্যকারণ সব মাদ্রা, আর আমরা যত বড় হব, ততই বুঝব যে, ছোট ছেলের পরীর গল্প যেমন আমাদের কাছে বোধ হয়, তেমনি যা কিছু আমরা দেখছি, সবই ঐরূপ অসংবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে কার্যকারণ বলে কিছু নেই, আর আমরা কালোতা জানতে পারব। সুতরাং যদি পার ত,

যখন কোন রূপক গল্প শুনবে, তখন তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে একটু নামিয়ে এনো, মনে মনে ঐ গল্পের পূর্বাঙ্গের সঙ্গতির বিষয় প্রশ্ন তুলো না। হৃদয়ে রূপক-বর্ণনা ও সুন্দর কবিত্বের প্রতি অসুরাঙ্গের বিকাশ কর, তারপর সমুদয় পৌরাণিক বর্ণনা-গুলিকে কবিত্ব হিসাবে উপভোগ কর। পুরাণচর্চার সময় ইতিহাস ও বিচারের দৃষ্টি নিয়ে এসো না। ঐ সব পৌরাণিক ভাবগুলি তোমার মনের ভিতর দিয়ে প্রবাহাকারে চলে যাক। তোমার চোখের সামনে তাকে মশালের মত ঘোরাও—কে মশালটা ধরে রয়েছে এ প্রশ্ন করো না, তা হলেই সেটা চক্রাকার ধারণ করবে, এতে যে সত্যের কণা অন্তর্নিহিত রয়েছে, তা তোমার মনে থেকে যাবে।

সকল পুরাণ-লেখকেরাই, তাঁরা যা যা দেখেছিলেন বা শুনে-ছিলেন, সেইগুলি রূপকভাবে লিখে গেছেন—তাঁরা কতকগুলি প্রবাহাকার চিত্র এঁকে গেছেন। তার ভিতর থেকে কেবল তার প্রতিপাদ্য বিষয়টা বার করবার চেষ্টা করে ছবিগুলিকে নষ্ট করে ফেলো না। সেগুলিকে যথার্থ গ্রহণ কর, সেগুলি তোমার উপর কার্য্য করুক। এদের ফলাফল দেখে বিচার করো—তাদের মধ্যে যেটুকু ভাল আছে, সেইটুকুই নাও।

* * * *

তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তিই তোমার প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকে—তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণা অসু-মারে সেটা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। আমরা তাকে বুদ্ধ,

যীশু, কৃষ্ণ, জিহোবা, আল্লা বা অগ্নি, যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে আমাদের আত্মা।

আমাদের ধারণার ক্রমে উৎকর্ষ হতে থাকে, কিন্তু ঐ ধারণা যে সকল রূপকাকারে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। আমাদের আলৌকিক দর্শনসমূহ অপেক্ষা মূশার আলৌকিক দর্শনে ভুলের সম্ভাবনা অধিক, কারণ, আমরা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং আমাদের মিথ্যা ভ্রম দ্বারা প্রতারণিত হবার সম্ভাবনা অনেক কম।

যতদিন না আমাদের হৃদয়রূপ শাস্ত্র খুলে, ততদিন শাস্ত্রপাঠ বৃথা। তখন ঐ শাস্ত্রগুলি আমাদের হৃদয়শাস্ত্রের সঙ্গে যতটা মেলে, ততটাই তাদের সার্থকতা। বলবান্ ব্যক্তিই বল কি তা বুঝতে পারে, হাতীই সিংহকে বুঝতে পারে, ইঁদুর কখন সিংহকে বুঝতে পারে না। আমরা যতদিন না যীশুর সমান হচ্ছি, ততদিন আমরা যীশুকে কেমন করে বুঝবো? দুখানা পাঁউরুটিতে ৫০০০ লোক খাওয়ান, অথবা ৫ খানা পাঁউরুটিতে দুজন লোক খাওয়ান, এই দুইই মায়াবী রাজ্যে। এদের মধ্যে কোনটাই সত্য নয়, সুতরাং এই দুটোর কোনটাই অপরটির দ্বারা বাধিত হয় না। মহত্বই কেবল মহত্বের আদর করতে পারে, ঈশ্বরই ঈশ্বরের উপলব্ধি করতে পারেন। একটা স্বপ্ন সেই স্বপ্নদ্রষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়, তার অন্ত কোন ভিত্তি নেই। ঐ স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টা পৃথক্ বস্তু নয়। সমগ্র সন্নীতটার ভিতর 'সোহহং' 'সোহহং' এই এক সুর বাজছে অন্যান্য সুরগুলি তারই

শুলটপালট মাত্র, সুতরাং তাতে মূল সুরের—মূল তকের কিছু এসে যায় না। জীবন্ত শাস্ত্র আমরাই, আমরা যে সব কথা বলেছি, সেইগুলিই শাস্ত্র বলে পরিচিত। সবই জীবন্ত ঈশ্বর, জীবন্ত খ্রীষ্ট—ঐ ভাবে সব দর্শন কর। মানুষকে অধ্যয়ন কর, মানুষই জীবন্ত কাব্য। জগতে এ পর্য্যন্ত যত বাইবেল, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ হয়েছে, সবই আমাদের জ্যোতিঃতে জ্যোতিমান। ঐ জ্যোতিঃকে ছেড়ে দিলে ঐগুলি আমাদের পক্ষে আর জীবন্ত থাকবে না, মৃত হয়ে যাবে। তোমার নিজ আত্মার উপর দাঁড়াও।

মৃতদেহের সঙ্গে ষেক্রপ ব্যবহারই কর না, সে তাতে কোন বাধা দেয় না। আমাদের দেহকে ঐরূপ মৃতবৎ করে ফেলতে হবে, আর তার সঙ্গে যে আমাদের অভিন্ন ভাব রয়েছে, সেটাকে দূর করে ফেলতে হবে।

৩রা আগষ্ট, শনিবার

যে সকল ব্যক্তি এই জন্মেই মুক্তিলাভ করতে চায়, তাদের এক জন্মেই হাজার বছরের কাজ করে নিতে হয়। তারা যে যুগে জন্মেছে, সেই যুগের ভাবের চেয়ে তাদের অনেক এগিয়ে যেতে হয়; কিন্তু সাধারণ লোক কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে পারে। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের এইরূপেই উৎপত্তি।

একজন হিন্দু রানী ছিলেন—তঁার ছেলেরা এই জন্মেই মুক্তিলাভ করুক, এই বিষয়ে তঁার এত আগ্রহ হয়েছিল যে, তিনি নিজেই তাদের লালনপালনের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন।

তিনি অতি শৈশবাবস্থা থেকে তাদের দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াবার সময় সর্বদা তাদের কাছে একটি গান গাইতেন—তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি। তাদের তিন জন সন্ন্যাসী হয়ে গেল, কিন্তু চতুর্থ পুত্রকে রাজা করবার জন্য অশ্রুত নিয়ে গিয়ে মানুষ করা হতে লাগল। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁর মা তাঁকে এক টুকরা কাগজ দিয়ে বলেন, ‘বড় হলে এতে কি লেখা আছে, পড়ো।’ সেই কাগজখানাতে লেখা ছিল—‘ব্রহ্ম সত্য, আর সব মিথ্যা। আত্মা কখন মরেনও না, মারেনও না। নিঃসঙ্গ হও, অথবা সংসঙ্গে বাস কর।’ যখন রাজপুত্র বড় হয়ে এইটি পড়লেন, তিনিও তখনই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।

সংসার ত্যাগ কর। আমরা এখন যেন এক পাল কুকুর—রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি, এক টুকরা মাংস খাচ্ছি, আর ভয়ে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে দেখছি—পাছে কেউ এসে আমাদের আড়িয়ে দেয়। তা না হয়ে রাজার মত হও—জেনে রাখ, সমুদয় জগৎ তোমার। যতক্ষণ না তুমি সংসার ত্যাগ করছ, যতক্ষণ সংসার তোমায় বাঁধতে থাকবে, ততক্ষণ এ ভাবটি তোমার কখনই আসতে পারে না। যদি বাইরে ত্যাগ করতে না পার, মনে মনে সব ত্যাগ কর। প্রাণের ভিতর থেকে সব ত্যাগ কর। বৈরাগ্যসম্পন্ন হও। এই হল যথার্থ আত্মত্যাগ—এ না হলে ধর্মলাভ অসম্ভব। কোন প্রকার বাসনা করো না; কারণ, যা বাসনা করবে তাই পাবে। আর সেইটাই তোমার ভয়ানক বন্ধনের

কারণ হবে। যেমন সেই গল্পে আছে এক ব্যক্তি তিনটি বর লাভ করেছিলেন এবং তার ফলে তার সর্ব্বাঙ্গে নাক • হয়েছিল, বাসনা করলে ঠিক সেই রকম হয়। যতক্ষণ না আমরা আত্মরত ও আত্মতৃপ্ত হচ্ছি, ততক্ষণ মুক্তিলাভ করতে পারছি না। আত্মাই আত্মার মুক্তিদাতা, অন্য কেহ নয়।

* গল্পটি এই :— একজন গরীব লোক এক দেবতার কাছে বর পেরেছিল। দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তুমি এই পাশা নাও। এই পাশা নিয়ে যে কোন কামনা করে তিনবার ফেলেবে, সে তিন কামনাই তোমার পূর্ণ হবে।' সে অমনি আহ্লাপে আটখানা হয়ে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল— কি বর চাওয়া যায়। স্ত্রী বলে, 'ধনদৌলত চাও।' কিন্তু স্বামী বলে, 'দেখ, আমাদের দুজনেরই নাক খাঁদা, তাই দেখে লোকে আমাদের বড় ঠাটা করে, অতএব প্রথমবার পাশা ফেলে হুন্দর নাক প্রার্থনা করা যাক।' স্ত্রীর মত কিন্তু তা নয়। শেষে দুজনে ঘোর তর্ক বাধল। শেষে স্বামী রেগে গিয়ে এই বলে পাশা ফেলে—'আমাদের কেবল হুন্দর নাক হক—আর কিছু চাই না। আশ্চর্য্য, যেমন পাশা ফেলা অমনি তাদের সর্ব্বাঙ্গে রাশি রাশি নাক হল। তখন সে দেখলে এ কি বিপদ হল, তখন দ্বিতীয়বার পাশা ফেলে বলে নাক চলে যাক। অমনি সব নাক চলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজের নাকও চলে গেল। এখন বাকি আছে তৃতীয় বর। তখন তারা জাবলে—যদি এইবার পাশা ফেলে ভাল নাক পাই, লোকে অবশ্য আমাদের খাঁদা নাকের বদলে— ভাল নাক হবার কারণ জিজ্ঞাসা করবে—তাদের অবশ্য সব কথা বলতে হবে। তখন তারা আমাদের আহ্বান্যক বলে এখনকার চেয়ে বেশী ঠাটা করবে; বলবে যে এরা এমন তিনটি বর পেরেও নিজের অবস্থার উন্নতি করতে পারলে না। কাজেই তৃতীয়বার পাশা ফেলে তারা তাদের পুরাতন খাঁদা নাকই ফিরিয়ে নিলে।

এইটি অশুভব করতে শিক্ষা কর যে, তুমি অন্য সকলের
 দেহেও বর্তমান—এইটি জানবার চেষ্টা কর যে, আমরা সকলেই
 এক। আর সব বাজে জিনিস ছেড়ে দাও। তুমি ভাল মন্দ
 যা কিছু কাজ করেছ, তাদের সম্বন্ধে একদম ভেবো না—
 সেগুলি ধু ধু করে উড়িয়ে দাও। যা করেছ, করেছ। কুসংস্কার
 দূর করে দাও। মৃত্যু সম্মুখে এলেও দুর্বলতা আশ্রয় করো না।
 অনুতাপ করো না—পূর্বে যে সব কাজ করেছ, সে সব নিয়ে
 মাথা ঘামিও না, এমন কি, যে সব ভাল কাজ করেছ, তাও
 স্মৃতিপথ থেকে দূর করে দাও। আজাদ (মুক্ত) হও।
 দুর্বল, কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তির কখনও আত্মাকে লাভ করতে
 পারে না। তুমি কোন কন্ঠের ফলকে নষ্ট করতে পার না—
 ফল আসবেই আসবে; সুতরাং সাহসী হয়ে তার সম্মুখীন হও,
 কিন্তু সাবধান যেন পুনর্বার সেই কাজ করো না। সকল কন্ঠের
 ভার সেই ভগবানের ঘাড়ে ফেলে দাও, ভাল, মন্দ—সব
 দাও। নিজে ভালটা রেখে কেবল মন্দটা তাঁর ঘাড়ে চাপিও
 না। যে নিজেকে নিজে সাহায্য না করে, ভগবান্ তাকেই
 সাহায্য করেন।

* * * *

“বাসনা-মদিরা পান করে সমস্ত জগৎ মত্ত হয়েছে।” “যেমন
 দিবা ও রাত্রি কখন একসঙ্গে থাকতে পারে না, সেইরূপ বাসনা
 ও ভগবান্ দুই কখন একসঙ্গে থাকতে পারে না।” সুতরাং
 বাসনা ত্যাগ কর।

'জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহাঁ, জহাঁ কাম তহাঁ নহাঁ' রাম ।
 'তুহঁ একসাথ মিলত নহাঁ, রব্ রজনী এক ঠাম ॥'

* * * *

"খাবার খাবার" বলে চোঁচান ও খাওয়া, "জল জল" বলে চোঁচান ও জল পান করা—এই দুটোর ভিতর আকাশ-পাতাল তফাৎ ; সুতরাং কেবল "ঈশ্বর ঈশ্বর" বলে চোঁচালে কখনও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশা করতে পারা যায় না । আমাদের ঈশ্বর লাভ করবার চেষ্টা ও সাধন করতে হবে ।

তরঙ্গটা সমুদ্রের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই অসীমত্ব লাভ করতে পারে, কিন্তু তরঙ্গ-অবস্থার থেকে কখন পারে না । তার পর সমুদ্রস্বরূপ হয়ে গিয়ে আবার তরঙ্গাকার ধারণ করতে পারে ও যত বড় ইচ্ছা তত বড় তরঙ্গ হতে পারে । নিজেকে তরঙ্গ বলে মনে করো না ; জান যে, তুমি মুক্ত ।

প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র হচ্ছে কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতিকে প্রণালীবদ্ধ করা । যেখানে বুদ্ধিবিচারের শেষ, সেইখানেই ধর্মের আরম্ভ । সমাধি বা ঈশ্বরভাবাবেশ বুদ্ধিবিচারের চেয়ে ঢের বড়, কিন্তু ঐ অবস্থায় উপলব্ধ সত্যগুলি কখনও বুদ্ধিবিচারের বিরোধী হবে না । বুদ্ধিবিচার মোটা হাতিয়ারের মত, তা দিয়ে শ্রমসাধ্য কাজগুলো করতে পারা যায়, আর সমাধি বা ঈশ্বরভাবাবেশ (Inspiration) উজ্জল আলোকের মত সব সত্য দেখিয়ে দেয় । কিন্তু আমাদের ভিতর একটা কিছু করবার ইচ্ছা বা প্রেরণা আমাদেরই ঈশ্বর-ভাবাবেশ (Inspiration) বলতে পারা যায় না ।

* * * * *

মায়ায় ভিতর উন্নতি করা বা অগ্রসর হওয়াকে একটি বৃত্ত বলে বর্ণনা করা যেতে পারে—এতে এই হয় যে, যেখান থেকে তুমি যাত্রা করেছিলে, ঠিক সেইখানে এসে পৌঁছবে। তবে প্রভেদ এই যে, যাত্রা করবার সময় তুমি অজ্ঞান ছিলে, আর সেখানে যখন ফিরে আসবে, তখন তুমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছ। ঈশ্বরোপাসনা, মাধু মহাপুরুষদের পূজা, একাগ্রতা, ধ্যান, নিকাম কর্ম—মায়ায় জাল কেটে বেরিয়ে আসবার এই সব উপায়; তবে প্রথমেই আমাদের তাঁর মুমুকুত্ব থাকা চাই। যে জ্যোতিঃ দপ্ করে প্রকাশ হয়ে আমাদের হৃদয়ানুককারকে দূর করে দেবে, তা আমাদের ভিতরেই রয়েছে—এ হচ্ছে সেই জ্ঞান, যা আমাদের স্বভাব বা স্বরূপ। (ঐ জ্ঞানকে আমাদের ‘জন্মগত স্বত্ব’ বলা যেতে পারে না, কারণ, প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্মই নেই।) কেবল যে মেঘগুলো ঐ জ্ঞানসূর্য্যাকে ঢেকে রয়েছে, আমাদের সেইগুলোকে দূর করে দিতে হবে।

ইহলোকে বা স্বর্গে সর্বপ্রকার ভোগ করবার বাসনা ত্যাগ কর (ইহামুক্ত-ফলভোগ-বিরাগ)। ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত কর (দম ও শম)। সর্বপ্রকার হুঃখ সহ্য কর, মন যেন জানতেই না পারে যে, তোমার কোনরূপ হুঃখ এসেছে (তিতিক্কা)। মুক্তি ছাড়া আর সব ভাবনা দূর করে দাও, গুরু ও তাঁর উপদেশে বিশ্বাস রাখ এবং তুমি যে নিশ্চিত মুক্ত হতে পারবেই, এটিও বিশ্বাস কর (শ্রদ্ধা)। যাই হক না কেন, সদাই বল সোহহং সোহহং। খেতে, বেড়াতে, কষ্টে পড়ে, সর্বদাই সোহহং সোহহং

বল, সর্বদাই মনকে বল যে, এই যে জগৎপ্রপঞ্চ দেখছি, কোন কালে এর অস্তিত্ব নেই, কেবল আমি মাত্র আছি (সমাধান)। দেখবে—একদিন দপ্ করে জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে বোধ হবে জগৎ শূন্যমাত্র, কেবল ব্রহ্মই আছেন। মুক্ত হবার জন্য প্রবল ইচ্ছা-সম্পন্ন হও (মুমুক্শু)।

আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সব পুরাণো অন্ধকূপের মত ; আমরা ঐ অন্ধকূপে পড়ে কর্তব্য, বন্ধন প্রভৃতি নানা স্বপ্ন দেখে থাকি—ঐ স্বপ্নের আর শেষ নেই। কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে আর ভ্রমের সৃষ্টি করো না। এ যেন বটগাছের মত, ক্রমাগত বুরি নামিয়ে বাড়তেই থাকে। যদি তুমি দ্বৈতবাদী হও, তবে ঈশ্বরকে সাহায্য করতে যাওয়াই তোমার আহ্বানিকি। আর যদি অদ্বৈতবাদী হও, তবে তুমি ত স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ—তোমার আবার কর্তব্য কি ? তোমার স্বামী, ছেলেপুলে, বন্ধুবান্ধব—কারণ প্রতি কিছু কর্তব্য নেই। যা হচ্ছে হয়ে যাক, চূপ্ চাপ্ করে পড়ে থাক।

“রামপ্রসাদ বলে ভব-সাগরে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা ;

যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা ॥”

শরীর মরে মরুক—আমার যে একটা দেহ আছে, এটা ত একটা পুরাণো উপকথা বই আর কিছু নয়। চূপ্ চাপ্ করে থাক, আর আমি ব্রহ্ম বলে জান।

কেবল বর্তমান কালই বিদ্যমান—আমরা চিন্তায় পর্য্যন্ত অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা করতে পারি না ; কারণ, চিন্তা করতে গেলেই তাকে বর্তমান করে ফেলতে হয়। সব ছেড়ে দাও, তার

যেখানে যাবার, ভেসে যাক। এই সমগ্র জগৎটাই একটা ভ্রমমাত্র, এটা যেন তোমার আর প্রভাবিত করতে না পারে। জগৎটাকে তুমি সেটা যা নয় তাই বলে জেনেছ, অবশ্বতে বস্তু জ্ঞান করেছ, এখন এটা বাস্তবিক যা একে তাই বলে জ্ঞান। যদি দেহটা কোথাও ভেসে যায়, যেতে দাও; দেহ যেখানেই যাক না কেন, কিছু গ্রাহ্য করো না, কর্তব্য বলে একটা কিছু আছে এবং তাকে পালন করতেই হবে—এইরূপ ধারণা ভীষণ কালকূটস্বরূপ—এতে জগৎকে নষ্ট করে ফেলছে।

স্বর্গে গেলে একটা বীণা পাবে, আর তাই বাজিয়ে যথাসময়ে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করবে—এর জন্তু অপেক্ষা করো না। এই-খানেই একটা বীণা নিয়ে আরম্ভ করে দাও না কেন? স্বর্গে যাবার জন্তু অপেক্ষা করা কেন? ইহলোকটাকেই স্বর্গ করে ফেল। তোমাদের বৃহস্পতি আছে, স্বর্গে বিবাহ করা বা বিবাহ দেওয়া নেই—তাই যদি হয়, এখনই তা আরম্ভ করে দাও না কেন? এইখানেই বিবাহ তুলে দাও না কেন? সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন মুক্তপুরুষের চিহ্ন। সংসারিত্বরূপ ভিক্ষুকের বেশ ফেলে দাও। মুক্তির পতাকা—গৈরিক বস্ত্র ধারণ কর।

৪ঠা আগষ্ট, রবিবার

‘অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে না জেনে উপাসনা করছে, আমি তোমার নিকট তাঁরই কথা প্রচার করছি’।

এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সকল জ্ঞাত বস্তুর চেয়ে আমাদের অধিক জ্ঞাত। তিনিই সেই এক বস্তু, যাকে আমরা সর্বত্র দেখছি। সকলেই তাদের নিজ আত্মাকে জানে, সকলেই এমন

কি, পশুরা পর্য্যন্ত জানে যে, আমি আছি। আমরা যা কিছু জানি, সব আত্মারই বহিঃপ্রসারণ, বিস্তারস্বরূপ। ছোট ছোট ছেলের এ তরু শিখাও, তারাও এ তরু ধারণা করতে পারে। প্রত্যেক ধর্ম (কোন কোন স্থলে অজ্ঞাতসারে হলেও) এই আত্মাকেই উপাসনা করে এসেছে, কারণ আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই।

আমরা এই জীবনটাকে এখানে যেমন ভাবে জানি, তার প্রতি একরূপ ঘৃণিতভাবে আসক্ত হয়ে থাকাই সমুদয় অনিষ্টের মূল। তাই থেকে এই সব প্রতারণা চুরি ইত্যাদি হয়ে থাকে। এরই জন্ত লোকে টাকাকে দেবতার আসন দেয়, আর তা থেকেই যত পাপ ও ভয়ের উৎপত্তি হয়। কোন জড়বস্তুকে মূল্যবান বলে মনে করো না, আর তাতে আসক্ত হয়ো না। তুমি যদি কিছুতে, এমন কি, জীবনে পর্য্যন্ত আসক্ত না হও, তা হলে আর কোন ভয় থাকবে না। “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশুতি।”—যিনি এই জগতে নানা দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন। আমরা যখন সবই এক দেখি, তখন আমাদের শরীরের মৃত্যুও থাকে না, মনের মৃত্যুও থাকে না। জগতের সকল দেহই আমার, স্মৃতরাং আমার দেহও নিত্য; কারণ, গাছপালা, জীবজন্তু, চন্দ্রসূর্য্য, এমন কি, সমগ্র জগদ্ব্রহ্মাণ্ডই আমার দেহ—তবে ঐ দেহের নাশ হবে কি করে? প্রত্যেক মন, প্রত্যেক চিন্তাই আমার—তবে মৃত্যু আসবে কি করে? আত্মা কখন জন্মানও না, মরেনও না—যখন আমরা এইটে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, তখন সকল সন্দেহ উড়ে যায়; ‘আমি আছি,’

‘আমি অনুভব করছি,’ ‘আমি সুখী হচ্ছি’—‘অস্তি, ভাতি, প্রিয়’—এগুলির উপর কখনই সন্দেহ করা যেতে পারে না। আমার সুখা বলে কিছু থাকতে পারে না, কারণ, জগতে যেকোনো যাকিছু থাকে, তা আমিই থাকি। আমাদের যদি এক গাছা চুল উঠে যায়, আমরা মনে করি না যে, আমরা মলাম। সেই রকম যদি একটা দেহের মৃত্যু হয়, ওত ঐ একগাছা চুল উঠে যাওয়ারই মত।

* * * *

সেই জ্ঞানাতীত বস্তুই ঈশ্বর—তিনি বাক্যের অতীত, চিন্তার অতীত, জ্ঞানের অতীত।.....তিনটে অবস্থা আছে,—পশুত্ব (তমঃ), মনুষ্যত্ব (রজঃ) ও দেবত্ব (সত্ত্ব)। যারা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করেন, তাঁরা অস্তিমাত্র বা সংস্করূপমাত্র হয়ে থাকেন। তাঁদের পক্ষে কর্তব্যের একেবারে নাশ হয়ে যায়, তাঁরা কেবল লোককে ভালবাসেন, আর চুষকের মত অপরকে তাঁদের দিকে আকর্ষণ করেন। এরই নাম মুক্তি। তখন আর চেষ্টা করে কোন সংকার্য করতে হয় না, তখন তুমি যে কাজ করবে, তাই সংকার্য হয়ে যাবে। ব্রহ্মবিৎ যিনি, তিনি সকল দেবতার চেয়েও বড়। যীশুখ্রীষ্ট যখন মোহকে জয় করে ‘শয়তান, আমার সামনে থেকে দূর হ’ বলেছিলেন, তখনই দেবতারা তাঁকে পূজা করতে এসেছিলেন। ব্রহ্মবিৎকে কেউ কিছু সাহায্য করতে পারে না, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ তাঁর সামনে প্রণত হয়ে থাকে, তাঁর সকল বাসনাই পূর্ণ হয়, তাঁর আশ্রয় অপরকে পবিত্র করে থাকে। অতএব যদি ঈশ্বরলাভের কামনা কর,

তবে ব্রহ্মবিদের পূজা কর। যখন আমরা দেবানুগ্রহরূপ মনুষ্যত্ব, মুমুক্শু ও মহাপুরুষসংশ্রয় লাভ করি, তখনই বৃত্তে হবে মুক্তি আমাদের করতলগত।

* * * *

চিরকালের জ্ঞান দেহের মৃত্যুর নামই নির্বাণ। এটা নির্বাণ-তত্ত্বের 'না'-এর দিক। এতে কেবল বলে, আমি এটা নই, ওটা নই। বেদান্ত আর একটু অগ্রসর হয়ে 'হাঁ-এর' দিকটা বলেন—ওরই নাম মুক্তি। 'আমি অনন্ত-সত্তা, অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত-আনন্দ, আমিই সেই'—এই হল বেদান্ত—একটা নিখুঁতভাবে তৈরী খিলানের যেন মাঝখানকার পাথর।

বৌদ্ধধর্মের উত্তরান্নায়ভুক্ত বেশীর ভাগ লোকই মুক্তিতে বিশ্বাসী—তারা যথার্থই বৈদান্তিক। কেবল সিংহলবাসীরাই নির্বাণকে বিনাশের সহিত সমানার্থকভাবে গ্রহণ করে।

কোনরূপ বিশ্বাস বা অবিশ্বাস 'আমি'কে নাশ করতে পারে না। যেটার অস্তিত্ব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ও যা অবিশ্বাসে উড়ে যায়, তা ভ্রমমাত্র। আত্মাকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। আমি আমার আত্মাকে নমস্কার করি। 'স্বয়ংজ্যোতিঃ আমি নিজেকেই নমস্কার করি, আমি ব্রহ্ম।' এই দেহটা যেন একটা অন্ধকার ঘর; আমরা যখন ঐ ঘরে প্রবেশ করি, তখনই তা আলোকিত হয়ে ওঠে, তখনই তা জীবন্ত হয়। আত্মার এই স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না, একে কোন মতেই নষ্ট করা যায় না। একে আবৃত করা যেতে পারে, কিন্তু কখনও নষ্ট করা যায় না।

বর্তমান যুগে ভগবানকে অনন্তশক্তিস্বরূপিনী জননীরূপে উপাসনা করা কর্তব্য। এতে পবিত্রতার উদয় হবে, আর এই মাতৃপূজার আমেরিকার মহাশক্তির বিকাশ হবে। এখানে (আমেরিকায়) কোন মন্দির (পৌরোহিত্যশক্তি) আমাদের গলা টিপে ধরে নেই, আর অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোর মত এখানে কেউ কষ্ট ভোগ করে না। স্ত্রীলোকেরা শত শত যুগ ধরে দুঃখ কষ্ট সহ করেছে, তাইতে তাদের ভিতর অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের বিকাশ হয়েছে। তারা কোন ভাব সহজে ছাড়তে চায় না। এই হেতুই তারা কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্ম সমূহের এবং সকল দেশের পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষকস্বরূপ হয়ে থাকে, আর এইটাই পরে তাদের স্বাধীনতার কারন হবে। আমাদের বৈদান্তিক হলে বেদান্তের এই মহান্ ভাবকে জীবনে পরিণত করতে হবে। নিম্নশ্রেণীর লোকদেরও ঐ ভাব দিতে হবে—এটা কেবল স্বাধীন আমেরিকাতেই কার্য্যে পরিণত করা যেতে পারে। ভারতে বুদ্ধ, শঙ্কর ও অন্যান্য মহামনীষী ব্যক্তি এই সকল ভাব লোকসমক্ষে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকে সেগুলি ধরে রাখতে পারেনি। এই নূতন যুগে নিম্নজাতির বেদান্তের আদর্শানুযায়ী জীবন যাপন করবে, আর স্ত্রীলোকদের দ্বারা এটা কার্য্যে পরিণত হবে।

“আদর করে হৃদে রাখ আদরিনী শ্রামা মাকে,

মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আর মন বিরলে দেখি,

রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে । (মাঝে মাঝে)
কুব্জি কুমত্ৰী বত, নিকট হতে দিল্লো নাক,
জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে ।”

“যত কিছু প্রাণী জীবনধারণ করছে, তুমি সেই সকলের
পারে । তুমি আমার জীবনের সুধাকরস্বরূপ, আমার আত্মারও
আত্মা ।”

রবিবার, অপরাহ্ন

দেহ যেমন মনের হাতে একটা যন্ত্রবিশেষ, মনও তেমনি আত্মার
হাতে একটা যন্ত্রস্বরূপ । জড় হচ্ছে বাইরের গতি, মন হচ্ছে
ভিতরের গতি । সমুদ্র পরিণামের আরম্ভ ও সমাপ্তি কালে ।
আত্মা যদি অপরিণামী হন, তিনি নিশ্চিত পূর্ণস্বরূপ ; আর
যদি পূর্ণস্বরূপ হন, তবে তিনি অনন্তস্বরূপ ; আর অনন্তস্বরূপ
হলে অবশ্যই তিনি দ্বিতীয়-রহিত ; কারণ, দুটি অনন্ত আর থাকতে
পারে না, সুতরাং আত্মা একমাত্রই হতে পারেন । যদিও
মাঝাকে বহু বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক । যদি
কোন ব্যক্তি সূর্যের অভিমুখে চলতে থাকে, প্রতি পদক্ষেপে
স এক একটা বিভিন্ন সূর্য দেখবে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে
কোনটি ত সেই একই সূর্য ।

‘অস্তিত্ব’ হচ্ছে সর্বপ্রকার একত্বের ভিত্তিস্বরূপ, আর ঐ
ভিত্তিতে যেতে পারলেই পূর্ণতা লাভ হয় । যদি সব রঙকে
এক রঙে পরিণত করা সম্ভব হত, তবে চিত্রবিষ্ঠাই লোপ
পারে যেতো । সম্পূর্ণ একত্ব হচ্ছে বিশ্রাম বা লয়স্বরূপ ;

আমরা সকল প্রকাশই এক ঈশ্বর হতে প্রসূত বলে থাকি। 'টাওবাদী', কুংফুছ (Confucius) মতাবলম্বী, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও জরতুষ্ট্র-শিষ্যগণ (Zoroastrians) সকলেই প্রায় একপ্রকার ভাষায়, "তুমি অপরের কাছ থেকে যে রূপ ব্যবহার চাও, অপরের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার কর"—এই অপূর্ব নীতি প্রচার করেছেন। কিন্তু হিন্দুরাই কেবল এই বিধির ব্যাখ্যা দিয়েছেন; কারণ তাঁরা এর কারণ দেখতে পেয়েছিলেন। মানুষকে অপর সকলকেই ভালবাসতে হবে; কারণ, সেই অপর সকলে যে, সে ছাড়া কিছু নয়। এক অনন্ত বস্তুই রয়েছে কিনা।

জগতে যত বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্য হয়েছেন, তন্মধ্যে কেবল লাওটজে, বুদ্ধ ও যীশুই উক্ত নীতিরও উপরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, 'তোমার শত্রুদিগকে পর্য্যন্ত ভালবাস,' 'যারা তোমায় ঘৃণা করে, তাদেরও ভালবাস।'

তৎসমূহ পূর্ব থেকেই রয়েছে; আমরা তাদের সৃষ্টি করি না, আবিষ্কার করি মাত্র। ধর্ম্ম কেবল প্রত্যক্ষানুভূতিমাত্র। বিভিন্ন মতামত পথস্বরূপ—প্রণালীস্বরূপ মাত্র, ওগুলো ধর্ম্ম নয়। জগতের যত ধর্ম্ম, সব বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী এক ধর্ম্মেরই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। শুধু মতে কেবল বিরোধ বাধিয়ে দেয়; দেখ না, কোথায় ঈশ্বরের নামে লোকের শান্তি হবে—তা

* খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে লাওটজে-প্রবর্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায়। ইহাদের মত প্রায় বোদ্ধসমূহ। 'টাও' এর ধারণা অনেকটা বোদ্ধদের নিষ্ঠুর ব্রহ্মসদৃশ।

না হয়ে জগতে যত রক্তপাত হয়েছে, তার অর্ধেক ঈশ্বরের নাম নিয়ে হয়েছে। একেবারে মূলে যাও ; স্বয়ং ঈশ্বরকেই জিজ্ঞাসা কর—তিনি ‘কিংস্বরূপ’ ? যদি তিনি কোন উত্তর না দেন, বুঝতে হবে তিনি নেই। কিন্তু জগতের সকল ধর্মই বলে যে, তিনি উত্তর দিয়ে থাকেন।

তোমার নিজের যেন কিছু বলবার থাকে, তা না হলে অপরে কি বলেছে, তার কোনরূপ ধারণা করতে পারবে কেন ? পুরাতন কুসংস্কার নিয়ে পড়ে থেকে না, সর্বদাই নূতন সত্যসমূহের জন্ম প্রস্তুত হও। “মূর্খ তারা, যারা তাদের পূর্বপুরুষদের খোঁড়া কুয়ার নোনতা জল খাবে, কিন্তু অপরের খোঁড়া কুয়ার বিশুদ্ধ জল খাবে না।” আমরা যতক্ষণ না নিজেরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করছি, ততক্ষণ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বভাবতঃ পূর্ণস্বরূপ। অবতারেরা তাঁদের এই পূর্ণস্বরূপকে প্রকাশ করেছেন, আমাদের ভিতর এখনও ওটা অব্যক্তভাবে রয়েছে। আমরা কি করে বুঝব—যে মুশা ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন, যদি আমরাও তাঁকে দেখতে না পাই ? যদি ঈশ্বর কখনও কারও কাছে এসে থাকেন ত আমরাও কাছে আসবেন। আমি একেবারে সোজাসুজি তাঁর কাছে যাব, তিনি আমার সঙ্গে কথা কন। বিশ্বাসকে ভিত্তি বলে আমি গ্রহণ করতে পারি না—সেটা নাস্তিকতা ও ঘোর ঈশ্বরনিন্দামাত্র। যদি ঈশ্বর হাজার বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা করে থাকেন, তিনি আজ আমার সঙ্গেও কথা কইতে পারেন। তা না হলে কি করে জানব, তিনি মরে যাননি ? যে কোন রকমে হক,

ঈশ্বরের কাছে এস—কিন্তু আসা চাই। তবে আসবার সময় যেন কাউকে ঠেলে ফেলে দিও না।

জ্ঞানী ব্যক্তির অজ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি করুণা রাখবেন। যিনি জ্ঞানী, তিনি একটা পিপড়ের জন্তু পর্য্যন্ত নিজের দেহ ত্যাগ করতে রাজী থাকেন, কারণ, তিনি জানেন, দেহটা কিছুই নয়।

এই আগষ্ট, সোমবার

প্রশ্ন এই,—সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করতে গেলে কি সমুদয় নিম্নতর সোপান দিয়ে যেতে হবে, না একেবারে লাফিয়ে সেই অবস্থায় যাওয়া যেতে পারে? আধুনিক মার্কিন বালক আজ যে বিষয়টা পঁচিশ বছরে শিখে ফেলতে পারে, তার পূর্ব পুরুষদের সে বিষয় শিখতে একশ বছর লাগত। আধুনিক হিন্দু এখন বিশ বছরে সেই অবস্থায় আরোহণ করে, যে অবস্থা পেতে তার পূর্ব-পুরুষদের আট হাজার বছর লেগেছিল। জড়ের দৃষ্টি থেকে দেখলে দেখা যায়, গর্ভে জন্ম সেই প্রাথমিক জীবাণুর (amoeba) অবস্থা থেকে আরম্ভ করে নানা অবস্থা অতিক্রম করে শেষে মানুষরূপ ধারণ করে। এই হল আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা। বেদান্ত আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, আমাদের শুধু সমগ্র মানব-জাতির অতীত জীবনটা যাপন করলেই হবে না, সমগ্র মানব-জাতির ভবিষ্যৎ জীবনটাও যাপন করতে হবে। যিনি প্রথমটি করেন, তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি; যিনি দ্বিতীয়টি করতে পারেন, তিনি জীবমুক্ত।

কাল কেবল আমাদের চিন্তার পরিমাপক মাত্র, আর চিন্তার

‘গতি অভাবনীরূপ ক্রম চল। আমরা কত শীঘ্র ভাবী জীবনটা যাপন করতে পারি, তার কোন সীমা নির্দেশ করা যেতে পারে না। সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন নিজ জীবনে অক্ষুণ্ণ করতে কতদিন লাগবে, তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারা যায় না। কারও কারও এক মুহূর্তে সেই অবস্থা লাভ হতে পারে, কারও বা পঞ্চাশ জন্ম লাগতে পারে। এটা ইচ্ছার তীব্রতার উপর নির্ভর করছে। সুতরাং শিষ্যের প্রয়োজনানুযায়ী উপদেশও বিভিন্নরূপ হওয়া দরকার। জলন্ত আগুন সকলের জন্তই রয়েছে— তাতে জল, এমন কি, বরফের চাঞ্চড় পর্য্যন্ত নিঃশেষ করে দেয়। এক রাশ ছটরা দিয়ে বন্দুক ছোড়, অন্ততঃ একটাও লাগবে। লোককে একেবারে এক রাশ সত্য দিয়ে দাও, তারা তার মধ্যে যেটুকু নিজের উপযোগী, তা নিয়ে নেবে। অতীত বহু বহু জন্মের ফলে যার যেমন সংস্কার গঠিত হয়েছে, তাকে তদনুযায়ী উপদেশ দাও। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম—এর মধ্যে যে কোন ভাবে মূল ভিত্তি কর; কিন্তু অন্যান্য ভাবগুলোও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি দিয়ে সামঞ্জস্য করতে হবে, যোগপ্রবণ প্রকৃতিকে যুক্তিবিচারের দ্বারা সামঞ্জস্য করতে হবে, আর কর্ম যেন সকল পথেরই অঙ্গরূপ হয়। যে যেখানে আছে, তাকে সেইখান থেকে ঠেলে এগিয়ে দাও। ধর্মশিক্ষা যেন ভাঙ্গাচোরার কাজে না থেকে গড়ার কাজ নিয়েই রাতদিন থাকে।

মানুষের প্রত্যেক প্রবৃত্তিই তার অতীতের কর্মসমষ্টির পরিচায়ক। এটা যেন সেই রেখা বা ব্যাসার্ধ, যাকে অক্ষরগ

করে তাকে চলতে হবে। আবার সকল ব্যাসার্ধ অবলম্বন করেই কেন্দ্রে যাওয়া যায়। অপরের প্রবৃত্তি উন্টে দেবার নামটি পর্য্যন্ত করো না, তাতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই ক্ষতি হয়ে থাকে। যখন তুমি জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছো, তখন তোমাকে জ্ঞানী হতে হবে, আর শিষ্য যে অবস্থায় রয়েছে, তোমাকে মনে মনে ঠিক সেই অবস্থায় অবস্থিত হতে হবে। অন্ত্যাত্ম যোগেও এইরূপ। প্রত্যেক বৃত্তির এমন ভাবে বিকাশ সাধন করতে হবে যে, যেন সেটি ছাড়া আমাদের অন্য কোন বৃত্তিই নেই—এই হচ্ছে তথাকথিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতিসাধনের যথার্থ রহস্য—অর্থাৎ গভীরতার সঙ্গে উদারতা অর্জন কর, কিন্তু সেটাকে হারিয়ে নয়। আমরা অনন্তস্বরূপ—আমাদের মধ্যে কোন কিছুই ইতি করা যেতে পারে না। সুতরাং আমরা সবচেয়ে নিষ্ঠাবান্ মুসলমানের মত গভীর, অথচ সবচেয়ে ঘোর নাস্তিকের মত উদার-ভাবাপন্ন হতে পারি। এটা কার্যে পরিণত করার উপায় হচ্ছে—মনকে কোন বিষয়বিশেষে প্রয়োগ করা নয়, আদত মনটারই বিকাশ করা ও তাকে সংযত করা। তা হলেই তুমি তাকে যে দিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারবে। এইরূপে তোমার গভীরতা ও উদারতা দুই-ই লাভ হবে। জ্ঞানের উপলব্ধি এমন ভাবে কর যে, জ্ঞান ছাড়া যেন আর কিছু নাই; তারপর ভক্তিয়োগ, রাজ্যযোগ, কর্মযোগ নিয়েও ঐ ভাবে সাধন কর। তরঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাও, তবেই তোমার ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গ উৎপাদন করতে পারবে। তোমার নিজের মনরূপ হৃদকে সংযত কর, তা না হলে তুমি অপরের মনরূপ হৃদের তত্ত্ব কখনও জানতে পারবে না।

তিনিই প্রকৃত আচার্য্য, যিনি তাঁর শিষ্যের প্রবৃত্তি বা কৃচি অনুযায়ী নিজের সমস্ত শক্তিটা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রকৃত সহানুভূতি ব্যতীত আমরা কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি না। মানুষ যে একজন দারিদ্র্যপূর্ণ প্রাণী—এ ধারণা ছেড়ে দাও ; কেবল পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই দারিদ্র্যজ্ঞান আছে। অজ্ঞান ব্যক্তির মোহমদিরা পান করে মাতাল হয়েছে, তাদের সহজ অবস্থা নেই। তোমরা জ্ঞানলাভ করেছ—তোমাদের তাদের প্রতি অনন্ত ধৈর্য্যসম্পন্ন হতে হবে। তাদের প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ভাব রেখো না ; তারা যে রোগে আক্রান্ত হয়ে জগৎটাকে ভ্রান্তদৃষ্টিতে দেখছে, আগে সেই রোগ নির্মূল কর ; তার পর যাতে তাদের সেই রোগ আরাম হয়, আর তারা ঠিক ঠিক দেখতে পার, তদ্বিষয়ে সাহায্য কর। সর্বদা স্মরণ রেখো যে, মুক্ত বা স্বাধীন পুরুষেরই কেবল স্বাধীন ইচ্ছা আছে—বাকি সকলেই বন্ধনের ভিতর রয়েছে—সুতরাং তারা যা করছে, তার জন্ত তারা দায়ী নয়। ইচ্ছা যখন ইচ্ছারূপেই থাকে, তখন তা বন্ধ। জল যখন হিমালয়ের চূড়ায় গলতে থাকে, তখন স্বাধীন বা উন্মুক্ত থাকে, কিন্তু নদীরূপ ধারণ করলেই তীরভূমি দ্বারা বন্ধ হয় ; তথাপি তার প্রাথমিক বেগই তাকে শেষে সমুদ্রে নিয়ে যায়, তথায় ঐ জল আবার সেই পূর্বের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। প্রথমটা অর্থাৎ নদীরূপে আবদ্ধ হওয়াকেই বাইবেল ‘মানবের পতন,’ (Fall of man) ও দ্বিতীয়টিকে পুনরুত্থান (Resurrection) বলে লক্ষ্য করে গেছেন। একটা পরমাণু পর্য্যন্ত, যতক্ষণ সে মুক্তাবস্থা লাভ না করছে ততক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

কতকগুলি কল্পনা অল্প কল্পনাগুলির বন্ধন ভাঙবার সাহায্য করে থাকে। সমগ্র জগৎটাই কল্পনা, কিন্তু এক রকমের কল্পনা-সমষ্টি অপর সব কল্পনাসমষ্টিকে নষ্ট করে দেয়। যে সব কল্পনা বলে যে জগতে পাপ, হুঃখ, মৃত্যু রয়েছে, সে সব কল্পনা বড় ভয়ানক ; কিন্তু অপর রকমের কল্পনা, যাতে বলে—‘আমি পবিত্রস্বরূপ, ঈশ্বর আছেন, জগতে হুঃখ কিছু নাই’—সেইগুলিই শুভ কল্পনা, আর তাতেই অত্যাগ্র কল্পনার বন্ধন কাটিয়ে দেয়। সগুণ ঈশ্বরই মানবের সেই সর্বোচ্চ কল্পনা, যাতে আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের পাবগুলি ভেঙ্গে দিতে পারে।

ওঁ তৎসৎ, অর্থাৎ একমাত্র সেই নিঃশূণ ব্রহ্মই মায়ার অতীত, কিন্তু সগুণ ঈশ্বরও নিত্য। যতদিন নায়াগারা-প্রপাত রয়েছে, ততদিন তাতে প্রতিকলিত রামধনুও রয়েছে ; কিন্তু এদিকে প্রপাতের জলরাশি-ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ঐ জলপ্রপাত জগৎপ্রপঞ্চস্বরূপ, আর রামধনু সগুণ ঈশ্বরস্বরূপ ; এই দুইটিই নিত্য। যতক্ষণ জগৎ রয়েছে, ততক্ষণ জগদীশ্বর অবশ্যই আছেন। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করছেন, আবার জগৎ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করছে—দুই-ই নিত্য। মারা সৎও নয়, অসৎও নয়। নায়াগারা-প্রপাত ও রামধনু উভয়ই অনন্ত কালের জগৎ পরিণামশীল—এরা মায়ার মধ্য দিয়ে দৃষ্ট ব্রহ্ম। পারসিক ও খ্রীষ্টিয়ানেরা মায়াকে দুই ভাগে ভাগ করে ভাল অর্ধেকটাকে ঈশ্বর ও মন্দ অর্ধেকটাকে শয়তান নাম দিয়েছেন। বেদান্ত মায়াকে সমষ্টি বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন এবং তার পশ্চাতে ব্রহ্মরূপ এক অখণ্ড বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন।

* * * * *

মহম্মদ দেখলেন, খ্রীষ্টধর্ম সেমিটিকভাব থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, আর ঐ সেমিটিক ভাবের মধ্য থেকেই খ্রীষ্টধর্মের কিরূপ হওয়া উচিত,—তার যে এক মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত—এইটিই তাঁর উপদেশের বিষয়। ‘আমি ও আমার পিতা এক’—এই আর্থোডক্স উপদেশের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত ছিলেন, ঐ উপদেশে তিনি ভয় খেতেন। প্রকৃতপক্ষে মানব হতে নিত্য পৃথক্ জিহোবা-সম্বন্ধীয় দ্বৈত ধারণার চেয়ে ত্রিত্ববাদের (Trinitarian) মত অনেক উন্নত। যে সকল ভাব-শৃঙ্খলা ক্রমশঃ ঈশ্বর ও মানবের একত্বজ্ঞান এনে দেয়, অবতারবাদ তাদের গোড়ার পাবস্বরূপ। লোকে প্রথম বোধে, ঈশ্বর একজন মানবের দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার পর দেখে, বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন মানবদেহে আবির্ভূত হয়েছেন, অবশেষে দেখতে পায়, তিনি সব মানুষের ভিতর রয়েছেন। অদ্বৈতবাদ সর্বোচ্চ সোপান—একেশ্বরবাদ তার চেয়ে নীচের সোপান। বিচারবুদ্ধির চেয়েও করুণা তোমায় শীঘ্র ও সহজে সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবে।

অন্ততঃ কয়েকজন লোক কেবল ঈশ্বরলাভের জগু চেষ্টা করুক, আর সমগ্র জগতের জগু ধর্ম জিনিসটাকে রক্ষা করুক। ‘আমি জনক রাজার মত নির্লিপ্ত’ বলে ভান করো না। তুমি জনক বটে, কিন্তু মোহ বা অজ্ঞানের জনকমাত্র। অকপট হয়ে বল, ‘আমি আদর্শ কি বুঝতে পারছি বটে, কিন্তু এখনও আমি তার কাছে এগুতে পারছি না।’ কিন্তু বাস্তবিক ত্যাগ না করে ত্যাগ করবার ভান করো না। যদি বাস্তবিকই ত্যাগ কর, তবে দৃঢ়ভাবে ঐ

ত্যাগকে ধরে থাক। লড়াইয়ে একশ লোকেরও পতন হক না, তবু তুমি ধ্বজা উঠিয়ে নাও ও এগিয়ে যাও : যেই পড়ুক না কেন, তা সবেও ঈশ্বর সত্য। যার যুদ্ধে পতন হবে, তিনি ধ্বজা অপরের হস্তে সমর্পণ করে যান—সে সেই ধ্বজা বহন করুক। ধ্বজা যেন ভূমিসাৎ না হয়।

* * * *

বাইবেলে আছে, প্রথমে ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, আর যা কিছু তা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি বলি, আমি যখন ধুরে পুঁছে পরিষ্কার হলাম, তখন আবার পবিত্রতা, অশুচিতা আমাতে জুড়ে দেবার কি দরকার? বরং আমি বলি, প্রথমেই স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর বাকি যা কিছু সব চলে যাক। তোমাতে নূতন কিছু আশুক, এ অন্বেষণ করো না বরং ঐশ্বলোকে ত্যাগ করতে পারলেই খুসী হও। ত্যাগ কর, আর জেনো যে, তুমি নিজে দেখতে না পেলেও তার ফল এক সময়ে না এক সময়ে ফলবেই। যীশু বারটি জেলে শিষ্য রেখেছিলেন, কিন্তু ঐ অল্প কটি লোকেই প্রবল রোমক সাম্রাজ্য ওলটপালট করে দিয়েছিল।

ঈশ্বরের বেদীতে, পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম ও সর্বোৎকৃষ্ট যা কিছু, তাই বলিস্বরূপে অর্পণ কর। যিনি ত্যাগের চেষ্ঠা করেন না, তাঁর চেয়ে যিনি চেষ্ঠা করেন, তিনি চের ভাল। একজন ত্যাগীকে দেখলেও তার ফলে হৃদয় পবিত্র হয়। ঈশ্বরকে লাভ করব—কেবল তাঁকেই চাই—এই বলে দৃঢ়পদে দাঁড়াও, দুনিয়া উড়ে যাক; ঈশ্বর ও সংসার—এই দুইএর মধ্যে কোন আপোষ

করতে যেও না। সংসার ত্যাগ কর, তা হলেই কেবল তুমি দেহ-বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারবে। আর ঐরূপে দেহে আসক্তি চলে যাবার পর দেহত্যাগ হলেই তুমি আজাদ বা মুক্ত হলে। মুক্ত হও, শুধু দেহের মৃত্যুতে আমাদের কখনও মুক্ত করতে পারে না। বেঁচে থাকতে থাকতেই আমাদের নিজ চেষ্টায় মুক্তিলাভ করতে হবে। তবেই যখন দেহপাত হবে, তখন সেই মুক্ত পুরুষের পক্ষে আর পুনর্জন্ম হবে না।

সত্যকে সত্যের দ্বারাই বিচার করতে হবে, অণু কিছুর দ্বারা নয়। লোকের হিত করাই সত্যের কষ্টিপাথর নয়। সূর্য্যকে দেখবার জগু আর মশালের দরকার করে না। যদি সত্য সমগ্র জগৎকে ধ্বংস করে, তা হলেও তা সত্যই—ঐ সত্য ধরে থাক।

ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি করা সহজ—তাইতেই সাধারণকে আকর্ষণ করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্য অনুষ্ঠানে কিছু নেই।

“যেমন মাকড়সা নিজের ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে আবার তাকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নেয়, সেইরূপ ঈশ্বরই এই জগৎপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, আবার নিজের ভিতর টেনে নেন।”

* * * *

৬ই আগষ্ট, মঙ্গলবার

‘আমি’ না থাকলে বাইরে ‘তুমি’ থাকতে পারে না। এই থেকে কতকগুলি দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমাতেই বাহ্য জগৎ রয়েছে—আমা ছাড়া এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ‘তুমি’ কেবল ‘আমাতেই’ রয়েছ। অপরে আবার ঠিক এর বিপরীত তর্ক করে গমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, ‘তুমি’ না থাকলে

‘আমার’ অস্তিত্ব প্রমাণই হতে পারে না। তাঁদের পক্ষেও যুক্তির বল সমান। এই দুটো মতই আংশিক সত্য—খানিকটা সত্য, খানিকটা মিথ্যা। দেহ যেমন জড় ও প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত, চিন্তাও তদ্রূপ। জড় ও মন উভয়ই একটা তৃতীয় পদার্থে অবস্থিত—এক অখণ্ড বস্তু আপনাকে দুভাগ করে ফেলেছে। এই এক অখণ্ড বস্তুর নাম আত্মা।

সেই মূল সত্তা যেন ‘ক’, সেইটেই মন ও জড় উভয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করছে। এই পরিদৃশ্যমান জগতে এর গতি কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে হয়ে থাকে, তাদেরই আমরা নিয়ম বলি। এক অখণ্ড সত্তা হিসাবে এটি মুক্তস্বভাব, বহু হিসাবে এটি নিয়মের অধীন। তথাপি এই বন্ধন সত্ত্বেও আমাদের ভিতর একটা মুক্তির ধারণা সদা সর্বদা বর্তমান রয়েছে, এরই নাম নিবৃত্তি অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ করা। আর বাসনাবশে যে সব জড়ত্ব-বিধায়িনী শক্তি আমাদের সাংসারিক কার্যে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত করে, তাহাদেরই নাম প্রবৃত্তি।

সেইকাজটাকেই নীতিসঙ্গত বা সংকর্ম্ব বলা যায়, যা আমাদের জড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। তার বিপরীত যা, তা অসং কর্ম্ব এই জগৎপ্রপঞ্চকে অনন্ত বোধ হচ্ছে, কারণ, এর মধ্যে সব জিনিসই চক্রগতিতে চলেছে; যেখান থেকে এসেছে, সেইখানেই ফিরে যাচ্ছে। বৃত্তের রেখাটি চলতে চলতে আবার নিজের সঙ্গে মিলে যায়, সুতরাং এখানে—এই সংসারে—কোনখানে বিশ্রাম বা শান্তি নেই। এই সংসাররূপ বৃত্তের ভিতর থেকে আমাদের বেরুতেই হবে। মুক্তিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র গতি।

* * * * *

মনের কেবল আকার বদলায়, কিন্তু তার গুণগত কোন পরিবর্তন হয় না। প্রাচীনকালে 'জোর যার মূলুক তার' ছিল, এখন চালাকি সেই স্থান অধিকার করেছে। ছুঃখকষ্ট আমেরিকায় যত তীব্র, ভারতে তত নয়; কারণ, এখানে (আমেরিকায়) গরীব লোকে নিজেদের ছুরবস্থার সঙ্গে অপরের অবস্থার খুব বেশী প্রভেদ দেখতে পায়।

ভাল মন্দ এই দুটো অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—একটাকে নিতে গেলে অপরটাকে নিতেই হবে। এই জগতের শক্তিসমষ্টি যেন একটা হৃদের মত—ওতে যেমন তরঙ্গের উত্থান আছে, ঠিক তদনুযায়ী একটা পতনও আছে। সমষ্টিটা সম্পূর্ণ এক—সুতরাং একজনকে সুখী করা মানেই আর এক জনকে অসুখী করা। বাইরের সুখ জড়সুখ মাত্র, আর তার পরিমাণ নির্দিষ্ট। সুতরাং এককণা সুখও পেতে গেলে, তা অপরের কাছ থেকে কেড়ে না নিয়ে পাওয়া যায় না। কেবল যা জড়জগতের অতীত সুখ, তা কারও কিছু হানি না করে পাওয়া যেতে পারে। জড়সুখ কেবল জড়ছুঃখের রূপান্তর মাত্র।

যারা ঐ তরঙ্গের উত্থানাংশে জন্মেছে ও সেইখানে রয়েছে, তারা তার পতনাংশটা, আর তাতে কি আছে, তা দেখতে পার না। কখনও মনে করো না, তুমি জগৎকে ভাল ও সুখী করতে পার। ঘানির বলদ তার সামনে বাঁধা গাছ কতক খড় পাবার জন্তু চেঁচা করে বটে, কিন্তু তাতে কোন কালে পৌঁছুতে পারে না, কেবল ঘানি ঘোরাতে থাকে মাত্র। আমরাও এইরূপে

সদাই সুখরূপ আলোয়ার অনুসরণ করছি—সেটা সর্বদাই আমাদের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে—আর আমরা শুধু প্রকৃতির ঘানিই ধোরাচ্ছি। এইরূপ ঘানি টানতে টানতে আমাদের মৃত্যু হল, তার পরে আবার ঘানি টানা আরম্ভ হবে। যদি আমরা অন্ততকে দূর করতে পারিতাম, তা হলে আমরা কখনই কোন উচ্চতর বস্তুর আভাস পর্যন্ত পেতাম না; আমরা তা হলে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতাম, কখনও মুক্ত হবার জন্ত চেষ্টা করতাম না। যখন মানুষ দেখতে পায়, জড়জগতে সুখের অন্বেষণ একেবারে বৃথা, তখনই ধর্মের আরম্ভ। মানুষের যত রকম জ্ঞান আছে, সবই ধর্মের অঙ্গমাত্র।

মানবদেহে ভালমন্দ এমন সামঞ্জস্য করে রয়েছে যে, তাইতেই মানুষের এ উভয় থেকে মুক্তিলাভ করবার ইচ্ছার সম্ভাবনা রয়েছে।

মুক্ত যে, সে কোন কালেই বন্ধ হয়নি। মুক্ত কি করে বন্ধ হল, এই প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। যেখানে কোন বন্ধন নেই, সেখানে কার্যকারণভাবও নেই। "আমি স্বপ্নেতে একটা শেয়াল হয়েছিলাম, আর একটা কুকুর আমার তাড়া করেছিল। এখন আমি কি করে প্রশ্ন করতে পারি যে, কেন কুকুর আমার তাড়া করেছিল? শেয়ালটা স্বপ্নেরই একটা অংশ, আর কুকুরটাও ঐ সঙ্গে আপনা হতেই এসে জুটল; কিন্তু দুইই স্বপ্ন, এদের বাহিরে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ই আমাদের এই বন্ধন অতিক্রম করবার সহায়স্বরূপ। তবে ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে প্রাচীন, আর আমাদের এই কুসংস্কার রয়েছে যে, ওটা বিজ্ঞানের চেয়ে পবিত্র। এক হিসাবে পবিত্রও বটে, কারণ, ধর্ম—নীতি বা

চরিত্রকে (Morality) তার একটি অত্যাবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে করে, কিন্তু বিজ্ঞান তা করে না।

“পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ, তাঁরা ঈশ্বরকে দর্শন করবেন।”
জগতে যদি সব শাস্ত্র এবং সব অবতার লোপ হয়ে যায়, তথাপি এই একমাত্র বাক্যই সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচিয়ে দেবে। অন্তরের এই পবিত্রতা থেকেই ঈশ্বরদর্শন হবে। বিশ্বরূপ সমগ্র সঙ্গীতে এই পবিত্রতাই ধ্বনিত হচ্ছে। পবিত্রতায় কোন বন্ধন নেই। পবিত্রতা দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ দূর করে দাও, তা হলেই আমাদের যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ হবে, আর আমরা জানতে পারব, আমরা কোন কালে বদ্ধ হইনি। নানাঐদর্শনই জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপ—সমুদয়কেই আত্মরূপে দর্শন কর ও সকলকেই ভালবাস। ভেদভাব সব একেবারে দূর করে দাও।

* * * *

পশুপ্রকৃতি লোকও ক্ষত বা পোড়া ঘার মত আমার দেহেরই একটা অংশ। তাকে তদ্বির যত্ন করে ভাল করে তুলতে হবে। দুই লোককেও সেইরকম ক্রমাগত সাহায্য করতে থাক, যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণ সেরে যাচ্ছে এবং আবার সুস্থ ও সুখী হচ্ছে।

আমরা যতদিন আপেক্ষিক বা দ্বৈতভূমিতে রয়েছি, ততদিন আমাদের বিশ্বাস করবার অধিকার আছে যে, এই আপেক্ষিক জগতের বস্তু দ্বারা আমাদের অনিষ্ট হতে পারে, আবার ঠিক সেই রকমে সাহায্যও হতে পারে। এই সাহায্যের ভাবটাকেই বিচার করে পৃথক করে নিলে যে জিনিস দাঁড়ায়, তাকেই আমরা ঈশ্বর

বলি। ঈশ্বর বলতে আমাদের এই ধারণা আসে যে, আমরা যত প্রকার সাহায্য পেতে পারি, তিনি তার সমষ্টিস্বরূপ।

যা কিছু আমাদের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যা কিছু কল্যাণকর, যা কিছু আমাদের সহায়ক, ঈশ্বর সেই সকলের সার সমষ্টিস্বরূপ। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের এই একমাত্র ধারণা থাকা উচিত। আমরা যখন নিজদের আত্মরূপে ভাবি, তখন আমাদের কোন দেহ নেই, সুতরাং 'আমি ব্রহ্ম, বিষেও আমার কিছু ক্ষতি করতে পারে না,' এই কথাটাই একটা স্ববিরোধী বাক্য। যতক্ষণ আমাদের দেহ রয়েছে, আর সেই দেহটাকে আমরা দেখছি, ততক্ষণ আমাদের ঈশ্বরোপলব্ধি হয়নি। নদীটারই যখন লোপ হল, তখন তার ভিতরের ছোট আবর্তটা কি আর থাকতে পারে? সাহায্যের জন্তু কঁাদ দেখি, তা হলে সাহায্য পাবে—আর অবশেষে দেখবে, সাহায্যের জন্তু কান্নাও চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যদাতাও চলে গেছেন—খেলা শেষ হয়ে গেছে, বাকি রয়েছেন কেবল আত্মা।

একবার এইটি হয়ে গেলে ফিরে এসে যেমন খুসী খেলা কর। তখন আর এই দেহের দ্বারা কোন অণ্ডায় কাজ হতে পারে না : কারণ, যতদিন না আমাদের ভিতরে কুপ্রবৃত্তিগুলো সব পুড়ে যাচ্ছে, ততদিন মুক্তিলাভ হবে না। যখন ঐ অবস্থা লাভ হয়, তখন আমাদের সব ময়লা পুড়ে যায়, আর অবশিষ্ট থাকে—“জ্যোতিরিব অধুমকম্” ও “দগ্ধেক্কনমিবানলম্”।

তখন প্রায়ক আমাদের দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু তার দ্বারা তখন কেবল ভাল কাজই হতে পারে, কারণ, মুক্তিলাভ

হবার পূর্বে সব মন্দ চলে গেছে। চোর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মরবার সময় তার প্রাক্তনকর্মের ফললাভ করলে।* সে নিশ্চিত পূর্বজন্মে যোগী ছিল, তারপর সে যোগব্রহ্ম হওয়াতে তাকে জন্মাতে হয় ; তার আবার পতন হওয়াতে তাকে পরজন্মে চোর হতে হয়েছিল। কিন্তু ভূতকালে সে যে শুভকর্ম করেছিল, তার ফল ফলল। তার মুক্তিলাভ হবার যখন সময় হল, তখনই তার যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা হল, আর তাঁর এক কথায় সে মুক্ত হয়ে গেল।

বুদ্ধ তাঁর প্রবলতম শত্রুকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ, সে ব্যক্তি তাঁকে এত ঘেঁষ করত যে, ঐ ঘেঁষবশে সে সর্বদা তাঁর চিন্তা করত। ক্রমাগত বুদ্ধের চিন্তায় তার চিন্তাশক্তি লাভ হয়েছিল, আর সে মুক্তিলাভ করবার উপযুক্ত হয়েছিল। অতএব সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা কর, ঐ চিন্তার দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।

ইহার পরদিন স্বামীজি নিউইয়র্ক চলিয়া যান।

* যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করবার সময় সেই সঙ্গে আর একজন চোরকেও ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল—সে যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করে তাঁর কৃপার মুক্ত হয়ে গেল—বাইবেলে এইরূপ উল্লিখিত আছে। ঐ ব্যক্তি তার পূর্ব কর্মফলেই যীশুখ্রীষ্টের কৃপা লাভ করেছিল।

